বিল্‌স শ্রম সংবাদ

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০২১

করোনায় শ্রমজীবী মানুষের উপর প্রভাব

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

সম্পাদকীয়

কোভিড-১৯ বা করোনা ভয়াবহতার কারনে সারা বিশ্বই একটি কঠিন সময় পার করছে। মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণে সারাবিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। এ দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষ। কর্ম হারিয়ে দিনের পর দিন না খেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। করোনার শুরুর দিকে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করলেও বর্তমানে দিনমজুর ও দিন এনে দিন খাওয়া কর্মহীন শ্রমিকদের খাদ্য চাহিদা পূরণে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে কর্মহীন মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

করোনার কারণে দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতের সোয়া ৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা আজ হুমকির মুখে পড়েছে। অর্থনীতিতেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উৎপাদন খাত, যা অর্থনীতিতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করছে। লাখ লাখ কারখানা শ্রমিক বেকার বসে আছেন। রিকশাচালক, গাড়িচালক, দিনমজুর, কৃষিশ্রমিক, দোকানদার, ফুটপাতের ছোট ব্যবসায়ী'সহ বিভিন্ন পেশার শ্রমিকেরা চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অনেক শ্রমিক গ্রামে ফিরে গেছেন। কেউ কেউ আবার কর্মস্থলে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। সুদিন ফেরার আশায় দিন গুনছেন তারা।

বর্তমানে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। সামনে তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতি ভালো থাকা অবস্থায় সরকারের উচিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো দূর করা এবং সম্ভাব্য তৃতীয় ঢেউয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া। করোনার ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যে অসচেতন, তার প্রমাণ তো আমরা পেলাম সাম্প্রতিককালেই। এর পর যদি করোনার তৃতীয় ঢেউ আসে, তাহলে সংক্রমণের সে ঢেউ ঠেকানো এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। এ প্রেক্ষাপটে করোনার বিস্তার বা সংক্রমণ প্রতিরোধকে তাই এই মুহূর্তের অন্যতম করণীয় কৌশল হিসেবে সব প্রয়াস প্রচেষ্টার ওপর স্থান দিতে হবে। টিকা প্রদানের গতি বাড়াতে হবে। সকলকে টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য টিকার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি তাদেরকে টিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সবাইকে সচেতনভাবে, দায়িত্বশীলতার সাথে প্রতিরোধমূলক যা যা উপায় অবলম্বন করা দরকার তাতে শামিল করতে পারলেই করোনার ব্যাপক বিস্তার রোধ ও ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা থামানোর প্রয়াস টেকসই হবে।

অদূর ভবিষ্যতে অধিকার, ন্যার্য মজুরি, বৈষম্যহীন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সহ সকল প্রাসঙ্গিক অধিকার আদায়ের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মো: মজিবুর রহমান ভূঞা
সম্পাদক

বিল্‌স শ্রম সংবাদ

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১

সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান

মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিল্‌স

নজরুল ইসলাম খান, মহাসচিব, বিল্‌স

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ

মেসবাহউদ্দীন আহমেদ

শহীদুল্লাহ চৌধুরী

রওশন জাহান সাথী

সম্পাদক

মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা

নির্বাহী সম্পাদক

মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সহযোগী সম্পাদক

মামুন অর রশিদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ:

মূদ্রণ:

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি: ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোন: +৮৮-০২-৪৮১১৮৮১৫, ৪৮১১৩৭৫৪, ৫৮১৫১৪০৯, ৫৮১৫১৩৯৪

ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইল : bils@citech.net

ওয়েব : www.bilsbd.org

সূচী

করোনায় শ্রমজীবী মানুষের উপর প্রভাব	৪
করোনার ক্ষতি কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শিল্প খাত	৬
দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে ৪৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প	৮
দরিদ্রদের তালিকা চূড়ান্ত করতেই পাঁচ বছর পার	৯
অর্ধেক মানুষের কাজের সঙ্গে শিক্ষার অমিল	১১
ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ওয়েবসাইট উদ্বোধন	১২
ব্যক্তিমালিকানাধীন পাট শিল্প: নিম্নতম মজুরি ৮০% বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করার সুপারিশ	১৩
সংকুচিত হয়ে পড়ছে বিদেশের শ্রমবাজার	১৪
কর্মসংস্থানের গতি শ্লথ, কমেছে বিনিয়োগ	১৫
বিদেশ থেকে ফিরে আসা নারী শ্রমিকদের অসহায় অবস্থা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন	১৮
গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি বাস্তবায়ন নিরীক্ষা এবং উত্তরণের উপায় শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন	১৯
প্রত্যাবাসী নারী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সুপারিশমালা অনুমোদন	২০
ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন ও উন্নয়নে সুপারিশ গ্রহণ শীর্ষক কর্মশালা	২১
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের যুবা সংগঠকদের পাঠচক্র অনুষ্ঠিত	২২
গৃহশ্রমিকদের শ্রম আইনে অন্তর্ভূক্ত করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে	২৩
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এডভোকেসী পরিকল্পনা কর্মশালা	২৪
জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে গোলটেবিল বৈঠক	২৫
সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে বিলস এর মত বিনিময় সভা	২৬
চট্টগ্রামে শ্রমিক সচেতনতামূলক ক্যাম্প	২৬
জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পকে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান	২৭
গৃহশ্রমিকদের উপর সহিংসতা বন্ধে নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি	২৮
পেশা পরিচিতি: জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ও জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক	২৯
শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ	৩২

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন:

করোনায় শ্রমজীবী মানুষের উপর প্রভাব

চীনের উহান প্রদেশে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এ সর্বপ্রথম শনাক্ত হয় নভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর প্রসার। পরবর্তীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ১১ মার্চ ২০২০-এ করোনা ভাইরাস কে 'মহামারী' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ভাইরাসটি অতিদ্রুত বিশ্বের ১৮৫টি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মহামারীটি বিশ্বজুড়ে মানব জীবনের সকল দিক প্রভাবিত করেছে। এটি অর্থনীতি, সমাজ ও মানুষের পারিবারিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২০ সাল থেকে গোটা পৃথিবী শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহতম সময় পার করছে। এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এত মারাত্মক যে বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতিগুলো এখনও এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে লড়াই করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশের বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও কোভিড-১৯ মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় লড়াই করছে। অনেক দেশে এরইমধ্যে তৃতীয় ঢেউ এর আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশেও করোনার প্রভাব ব্যাপক। শিল্প উৎপাদন থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে স্থবিরতা বিদ্যমান। বাংলাদেশে লকডাউন শুরুর পর ব্র্যাকের এক জরিপে দেখা গেছে নিম্ন আয়ের ১৪ শতাংশ মানুষের ঘরে খাবার নেই। পরে নিশ্চয়ই তা আরও বেড়েছে। অন্যদিকে, দেশের শ্রমজীবী মানুষের ৮৫ ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করেন এবং ৫৫.৫ ভাগ মানুষের দৈনিক আয় মাত্র ১৬১-৩২২ টাকা। কয়দিনই বা তারা কাজে না গিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন? আবার যখন মানুষকে ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে তখন দেখতে হবে কত শতাংশ মানুষের কয়দিন ঘরে বসে খাওয়ার সামর্থ্য আছে।

করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বজুড়ে ১৬০ কোটি কর্মজীবী মানুষ তাদের কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। সংস্থাটির ওই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বিশ্বজুড়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় দুইশো কোটি। তার ১৬০ কোটি মানুষই কর্ম হারানোর ঝুঁকিতে, যা সারা বিশ্বে কর্মের সঙ্গে জড়িত মানুষের প্রায় অর্ধেক।

আইএলও'র হিসাব মতে, সারা বিশ্বে শ্রমের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা ৩৩০ কোটি। করোনা পরিস্থিতির শুরুর দিকে কর্মসংস্থানের

উপর যে প্রভাব ছিল, এখন তা স্বভাবতই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ করোনার উচ্চসংক্রমণ ঝুঁকির মাঝেও স্বল্প-আকারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালু করলেও এতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হচ্ছে। বাংলাদেশেও একই পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক কর্মকান্ড শুরু করেছে সরকার। তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা খোলাসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের নানান ক্ষেত্রে গতি আনার চেষ্টা করে চলেছে সরকার। তথ্য অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাবে এরইমধ্যে দেশে এক কোটিরও বেশি মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, করোনা যে ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও নাজুক অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। এরইমধ্যে সংকুচিত হয়ে এসেছে কর্মক্ষেত্র। আর্থিক সংগতির অভাবে মানুষের চাহিদা অনুপাতে সম্পদ সরবরাহ কমে গেছে। এর পরিণতিতে সব ধরনের শিল্প উৎপাদনে মারাত্মক ধস নেমেছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে করোনাকাল থেকে যদি উত্তরণও ঘটে, তবে এ সময়ের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠবে।

করোনার কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। গত প্রায় দেড় বছর ধরে দেশের শ্রমবাজারে নতুন আসা কর্মীদের যেমন কর্মসংস্থান হয়নি, তেমনি আগের চাকরিজীবীদের অনেকে কর্মচ্যুত হয়েছেন। ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৩ লাখ। তবে, কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানো হচ্ছে, প্রবাসীদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে, শিল্প-কৃষি-ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ বাড়ানো হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে আশা করা যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের সহযোগী এক সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার নতুন আঘাত না এলে ২০২৩ সালের মধ্যে অর্থনীতি গতিশীল হবে। নতুন করে করোনার আঘাত এলে অর্থনীতিতে গতি আসতে আরও সময় লাগবে।

সরকার করোনার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় দুই দফায় প্রণোদনা প্যাকেজের আকার বাড়িয়ে ১ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকা করেছে। দেশের অর্থনীতিতে গতি বাড়াতে সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিলেও গত দেড় বছরে দেশে নতুন বিনিয়োগ কম হয়েছে। দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। সরকার তাদের জন্য তহবিল বরাদ্দ করলেও তাদের অনেকে ব্যাংক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছেন না। এসব খাতের উদ্যোক্তাদের ঋণ দিয়ে চাঙ্গা করা গেলে তা কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে। যারা কৃষিকর্মে নিয়োজিত তাদের বেশিরভাগই সারা বছর কাজ পান না। করোনার কারণে কৃষি, সেবা, শিল্প-সব খাতের কর্মীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এর মধ্যে কৃষি খাতের শ্রমিকরা মৌসুমি ভিত্তিতে নিজ কর্মে ফিরে যেতে পারলেও সেবা ও শিল্প খাতের বিপুলসংখ্যক কর্মী কাজে ফিরে যেতে পারেননি।

গত কয়েক বছর দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় সংকট ছিল বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে স্থবিরতা। করোনা এসে সেই সংকটকে মহাসংকটে রূপ দিয়েছে। আইএলও'র মতে, বাংলাদেশে করোনায় ১৬ লাখ ৭৫ হাজার কর্মী কাজ হারিয়েছেন। বিবিএসের হিসাবে প্রতিবছর গড়ে শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে ২৪ লাখ ৩৪ হাজার মানুষ। এ হিসাবে গড়ে দেড় বছরে শ্রমবাজারে নতুন এসেছেন সাড়ে ৩৬ লাখ কর্মী, যাদের বেশিরভাগের কর্মসংস্থান হয়নি। বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য মুদ্রানীতিতে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাড়ছে না। এতে নতুন কর্মসংস্থানের গতিও শ্লথ হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে কাঙ্খিত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে বিনিয়োগের আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

আমদানি নির্ভরতার কারনে বাংলাদেশের শিল্প ও রপ্তানি খাত লকডাউনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদন বন্ধ বা হ্রাস পাওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির স্বীকার হয় শ্রমজীবী মানুষ। টিকে থাকার প্রশ্নে শ্রমিক ছাঁটাই করতে বাধ্য হয় অনেক প্রতিষ্ঠান। ফলে কর্মহীন হয়ে পড়ে অনেক মানুষ। তাছাড়া অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মের স্থায়িত্বের কোনো গ্যারান্টি নেই। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে স্বনিয়োজিত কর্মীরাও বিপাকে পড়ে লকডাউনে, অনেকে ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষিত বেকার সংখ্যা ও লকডাউন প্রজন্ম (লকডাউন বা অনান্য যেকোনো কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার সময় যে প্রজন্ম শ্রমবাজারে প্রবেশের কথা কিন্তু কর্মসংস্থানের সংকটের ফলে প্রবেশ করতে পারছে না তারা) বৃদ্ধি পায়।

দেশের শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন, কর্মসংস্থান হারানো নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের তথ্য দিচ্ছেন। এর মধ্যে একটি হিসাব বলছে, কভিডকালে বহু লোক চাকরি হারিয়েছে, এর মধ্যে ৮৫ শতাংশের মতো কাজে ফিরেছে। কিন্তু একই খাতে না। অন্য খাতে বিশেষ করে কৃষি খাতে কাজে যোগ দিয়েছে, এদের কর্মঘণ্টা অনেক কমেছে। আসলে প্রকৃত চিত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধাটা হলো দেশের ৮৫ শতাংশ কর্মসংস্থানই অনানুষ্ঠানিক। এদের কাজ নিয়ে সঠিক হিসাব কী করে সম্ভব?

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ অনেকটাই সামলে উঠছে বাংলাদেশ। কয়েকদিন ধরে সংক্রমণের হার দশ শতাংশের নিচে। পশ্চিমা দেশগুলোর অভিজ্ঞতা ও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তৃতীয় ঢেউয়ের প্রস্তুতি থেকে বাংলাদেশেও তৃতীয় দফায় ভাইরাস সংক্রমণের আরেকটি ধাক্কা আসার আশঙ্কা করছেন প্রশাসনের শীর্ষ

কর্মকর্তারা। ইতোমধ্যে ভারতে করোনার তৃতীয় ঢেউ সামলাতে চার দফা অগ্রিম পরিকাঠামো ঘোষণা করেছে সে দেশের সরকার। এর আগে দুইবারের করোনা সংক্রমণ ভারতের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও বেড়েছে। তাই ভারতের অগ্রিম পরিস্থিতির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে সরকার।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রথমবার করোনা সংক্রমণের সময় কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। ওই সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয়বার যতটা প্রস্তুত থাকা দরকার ছিল তাতেও কিছু ঘাটতি ছিল। এসব সমালোচনা কার্যত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক হলেও সামগ্রিকভাবে তা সরকারের উপরই আসে। তাই তৃতীয়বার যদি ভাইরাসের আক্রমণ আসে তাহলে আগের চেয়ে অনেক ভালো প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে চায় সরকার।

অন্যদিকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে টিকা দেওয়াকে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ মোট জনসংখ্যার বিপরীতে করোনা টিকা দেওয়ার হারে অনেক পিছিয়ে আছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র আফগানিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধানদের নিয়ে গঠিত কভিড-১৯ টাস্কফোর্সের এক ওয়েবসাইটে এসব তথ্য দেওয়া হয়। এতে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২.৬১ শতাংশ মানুষকে দুই ডোজ টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে জনসংখ্যার অনুপাতে এক ডোজ টিকা দেওয়া হয়েছে ৪.১৮ শতাংশ মানুষকে। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এই হার একেবারেই যথেষ্ট নয় বলে জানান জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সংক্রমণ ও মৃত্যু কমলেও দেশে শিগগির করোনার আরেকটি ঢেউ আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই সংক্রমণ কমায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ নেই বলে মত দিয়েছেন তারা। সংক্রমণ কমে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ মানুষের সচেতনতা কমতে থাকায় তাদের এই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া, ভারতে করোনা পরিস্থিতির পরিবর্তনও তাদের আশঙ্কার একটি কারণ।

করোনার ক্ষতি কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শিল্প খাত

চীনে করোনাভাইরাস আঘাত হানার পর গত বছরের শুরুতে বাংলাদেশেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গত বছরের মার্চে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় দেশে। সংক্রমণ ঠেকাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে এক বছরের বেশি সময় ধরে চলে বিধিনিষেধ। তাতে স্থবির হয়ে পড়ে দেশের প্রায় সব ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের সেই স্থবিরতা কাটাতে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ায় সরকার। ঘোষণা করা হয় লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা। সরকারের দেওয়া সেই প্রণোদনা ঋণ বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করছে। সেই তথ্যও মিলছে প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভ-লোকসানের হিসাব দেখে। গত বছরের জানুয়ারি-মার্চ সময়কালে এসিআই লিমিটেডের নিট মুনাফা ছিল ৩৭ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটি প্রণোদনা তহবিল থেকে স্বল্প সুদে ৩২৭ কোটি টাকা ঋণ নেয়। এ ঋণের টাকা দেওয়া হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধন হিসেবে ব্যবহারের জন্য। এরপর চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে এসিআই মুনাফা করেছে ৪৯ কোটি টাকা। ভোগ্যপণ্য, ওষুধ, নিত্যব্যবহার্য পণ্য, কৃষি ও বাণিজ্যিক যানবাহন, মোটরসাইকেলসহ নানা খাতের ব্যবসা রয়েছে এসিআই লিমিটেডের। করোনার ক্ষত কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে দেশের অন্যতম বড় এই শিল্প গ্রুপ।

ইস্পাত খাতের দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিএসআরএম স্টিলের কারখানাও গত বছর করোনার শুরুতে বন্ধ হয়ে যায়। তাতে ২০২০ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে প্রতিষ্ঠানটি মুনাফা করে

৫৪ কোটি টাকা। করোনার ক্ষতি পোষাতে প্রতিষ্ঠানটি প্রণোদনা তহবিল থেকে ৬৪১ কোটি টাকা ঋণ নেয়। সেই ঋণ ব্যবসার কাজে লাগানো হয়। তাতে চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চে কোম্পানিটির মুনাফা বেড়ে হয়েছে ১৩৮ কোটি টাকা। ক্ষত কাটিয়ে আবারও স্বাভাবিক মুনাফার ধারায় ফিরতে শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিএসআরএম গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন সেনগুপ্ত বলেন,'সরকারের প্রণোদনার ঋণসুবিধা নিয়ে আমরা ব্যবসার কাজে লাগাই। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর কারখানা চালু হয়। এখন উৎপাদন আবারও আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। তবে বিশ্ববাজারে কাঁচামালের দাম বাড়ায় একটু চাপে রয়েছি।'

প্রণোদনার ঋণে বিভিন্ন খাতের বড় শিল্প গ্রুপগুলোর অনেকে ছন্দে ফিরে এলেও কারও কারও বিরুদ্ধে স্বল্প সুদের এ অর্থ ভিন্ন কাজে ব্যয়ের অভিযোগও উঠেছে। ঋণ নিয়ে তা ফেরত দিতে গড়িমসি শুরু করেছে অনেকে। আবার দ্রুত প্রণোদনার ঋণ বিতরণ করতে গিয়ে যথাযথ বাছবিচার না করে কিছু প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। যাদের কাছ থেকে সময়মতো ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

শিল্প ও সেবা খাতের জন্য প্রণোদনা তহবিলটি ৩৩ হাজার কোটি টাকার। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে এ তহবিলের ঋণ বিতরণ শুরু হয়। এখন পর্যন্ত দুই হাজার প্রতিষ্ঠান এ তহবিল থেকে ৩২ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। ঋণের সুদহার ৯ শতাংশ। যার মধ্যে অর্ধেক সুদ জনগণের করের টাকায় সরকার বহন করছে। বাকি সাড়ে ৪ শতাংশ সুদ দিতে হচ্ছে ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ীদের। এই ঋণের শর্ত শুধু চলতি মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোই কেবল এই ঋণ পাবে। প্রণোদনার ঋণ নিয়ে বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখন সময় এসেছে কম সুদের এসব ঋণ ফেরত দেওয়ার।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের সাবেক মহাপরিচালক তৌফিক আহমদ চৌধুরী বলেন, নিঃসন্দেহে এই প্রণোদনা সরকারের একটি ভালো উদ্যোগ। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়াতে পারছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঋণের টাকা কারা পেয়েছে ও কোথায় তা ব্যবহার হয়েছে তা নিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই ছাড়াই ঋণ দেওয়া হয়েছে। ফলে এসব ঋণ আদৌ ফেরত আসবে কি না, সেই প্রশ্ন রয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয় দফায় যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে তদারকি বাড়াতে হবে।

দেশের ব্যাংকগুলো থেকে শিল্প ও সেবা খাতের ঋণ গ্রহণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শীর্ষ ১০০ ঋণগ্রহীতার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছে সরকারি সংস্থা বিমান বাংলাদেশ। সংস্থাটিকে প্রণোদনা তহবিল থেকে সোনালী ব্যাংক ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। আবুল খায়ের গ্রুপ ঋণ পেয়েছে ১ হাজার ১৭১ কোটি টাকা। এস আলম গ্রুপ ঋণ পেয়েছে ১ হাজার ৮৬ কোটি টাকা। সিটি গ্রুপ পেয়েছে ৮২৭ কোটি টাকা ও বসুন্ধরা গ্রুপ ৬৭৮ কোটি টাকা। এর বাইরে বিএসআরএম ৬৪১ কোটি টাকা, নোমান গ্রুপ ৫৯৯ কোটি টাকা ও প্রাণ গ্রুপ ৫৫৯ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। এসব গ্রুপের মধ্যে কখনোই ঋণ খেলাপি হয়নি এমন প্রতিষ্ঠান যেমন আছে, তেমনি আছে অতীতে ঋণখেলাপি হওয়া কিছু প্রতিষ্ঠান।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল বলেন, 'করোনার শুরুতে বড় সমস্যায় পড়েছিলেন কৃষকেরা। আমাদের বিক্রিও কমে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে এক লাখ কৃষক কৃষি সবজি, চাল, দুধ উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। করোনা হলেও তাঁদের থেকে এসব কাঁচামাল সংগ্রহ এক দিনের জন্য বন্ধ করা হয়নি। দুধ সংগ্রহ করে পাউডার করে রেখেছি। আম, পেয়ারাসহ যেসব মৌসুমি ফসল উৎপাদিত হয়েছে, তা কিনে রেখেছি। প্রণোদনার ঋণ পাওয়ায় কৃষকের পাশে থাকার সুযোগ হয়েছে। এখন ব্যবসা অনেকটা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।'

এ ছাড়া মেঘনা ৩৭১ কোটি টাকা, কেএসআরএম ৩২৮ কোটি টাকা, এসিআই ৩২৭ কোটি টাকা, জিপিএইচ ২৯০ কোটি টাকা, নাভানা ২৬৮ কোটি টাকা, বেক্সিমকো ২৬০ কোটি টাকা, থার্মেক্স গ্রুপ ২৩৮ কোটি টাকা, যমুনা গ্রুপ ২১৯ কোটি টাকা, নাসা গ্রুপ ১৮৫ কোটি টাকা ও প্রণোদনা তহবিল থেকে ইউনিটেক্স গ্রুপ ঋণ পেয়েছে ১৮৩ কোটি টাকা। প্রণোদনার ঋণ পাওয়ার তালিকার শীর্ষ এক শর্তে আরও রয়েছে বেঙ্গল, সাদ মুসা, জজ ভূঁইয়া, গাজী গ্রুপসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম।

জানা গেছে, যারা প্রথম দফায় ঋণ পেয়েছে, তারাই আবার দ্বিতীয় দফা ঋণ নিতে শুরু করেছে। ঋণ ফেরত আসা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও ব্যাংকাররা বলছেন, তাঁরা আশাবাদী। অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শামস-উল-ইসলাম বলেন, প্রণোদনার ঋণের কিস্তি ফেরত আসছে। আশা করছি ঋণের বড় অংশ যথাসময়ে ফেরত আসবে।

তবে জানা গেছে, অনেক ব্যবসায়ী ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেছেন। এসব ঋণের মেয়াদ ছিল এক বছর। মেয়াদ শেষ হয়ে আসায় অনেকে মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করছেন। প্রিমিয়ার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম রিয়াজুল করিম বলেন, 'গ্রাহকদের কেউ কেউ মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করছেন। এ অবস্থায় ঋণ কবে ফেরত আসবে, বুঝতে পারছি না।' প্রণোদনার ঋণের অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠায় চলতি মাস থেকে সরেজমিন পরিদর্শন শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম বলেন,

'প্রণোদনার ঋণের অভিযোগ আসায় এসব ঋণের অপব্যবহার তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অগ্রণী ও সাউথইস্ট ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ বলেন, অতীতে বারবার খেলাপি হওয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও প্রণোদনার ঋণ পেয়েছে। এটা কোনোভাবেই ঠিক হয়নি। প্রণোদনার বড় অংশই পেয়েছে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো। ছোটরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ঋণ পায়নি। বড়দের মধ্যে প্রণোদনার ঋণ পুঞ্জীভূত হওয়ায় এসব ঋণ আদায় না হলে আরেক বড় কেলেঙ্কারি ঘটবে।

সূত্র: প্রথম আলো; ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলতে ৪৩০০ কোটি টাকার প্রকল্প

যুব সমাজ, নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের উপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক কর্মীবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্পের অনুমোদন করেছে।

৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এনইসি সভাকক্ষে একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে সভায় যোগদান করেন।

সভাশেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান একনেকে অনুমোদিত প্রকল্পের বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি জানান, একনেক সভায় ৭ হাজার ৫৮৯ কোটি ৭২ লাখ টাকা ব্যয়ে মোট ৮টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ৫ হাজার কোটি ৭২ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ সহায়তা থেকে ২ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে ৬টি নতুন প্রকল্প এবং ২টি সংশোধিত প্রকল্প রয়েছে।

যুবসমাজ, নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের উপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক কর্মীবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'এক্সসিলারেটিং অ্যান্ড স্ট্রেনথদেনিং স্কিলস ফর ইকনোমিক ট্রান্সফারমেশন (এএসএসইটি)' প্রকল্পটি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্প ব্যয়ের ১ হাজার ৭২০ কোটি টাকা সরকার অর্থায়ন করবে এবং বাকি ২ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে প্রকল্প সাহায্য পাওয়া যাবে।

এম এ মান্নান বলেন, দেশে দক্ষ শ্রমশক্তির অভাব রয়েছে। তাই দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম জানান, ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ট সুবিধাকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর

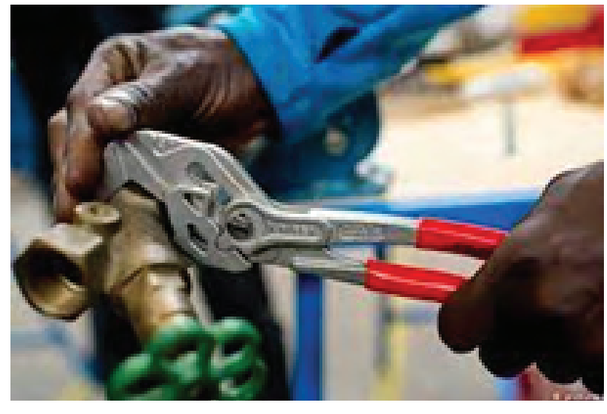

ক্ষেত্রে এএসএসইটি অত্যন্ত সময়োপযোগী প্রকল্প বলে প্রধানমন্ত্রী অভিহিত করেছেন।

প্রকল্পটি বাস্তবয়ায়ন হলে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মান উন্নতি হওয়ার পাশাপাশি যুবসমাজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশ-বিদেশে মানসম্মত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে পরিকল্পনা কমিশনের মতামতে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় মহিলা এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ যুবসমাজ ও কর্মীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরির লক্ষ্যে তাদেরকে চাহিদাভিত্তিক দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা দেশের বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-অনাবাসিক ভবন নির্মাণে ১৫ একর জমি অধিগ্রহণ, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ অনুদান, প্রকল্প অনুদান, কনসালটেন্সি, সেমিনার ও কনফারেন্স, আইসিটি সরঞ্জাম, কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়, অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সেক্টরে কোভিড-১৯ মোকাবিলা সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরিতে সহায়তা প্রদান।

একনেক সভায় ১ হাজার ১৪২ কোটি ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে

'পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রকল্প ব্যয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সরকার অর্থায়ন করবে।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আগেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এক প্রশ্নের উত্তরে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মামুন-আল-রশীদ বলেন, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সব ধরনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

পরিবেশ দূষণ কমাতে শিল্প মালিকরা যেন শিল্প-কারখানায় সিইটিপি ও ইটিপি স্থাপন করেন সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি হিলি, বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারী শুল্ক স্টেশনে পণ্য ও যাত্রী স্ক্যানার মেশিন বসানোর নির্দেশ প্রদান করেন।

একনেকে অনুমোদিত অন্য প্রকল্পসমূহ হলো-হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প; ব্যয় ধরা হয়েছে ৮০ কোটি ৬১ লাখ টাকা। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার রংপুর স্থাপন প্রকল্প, ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র (মাদারীপুর) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬৮ কোটি টাকা। সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী থেকে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১২৮ কোটি ২২ লাখ টাকা। সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নম্বর ১৫ পুনর্বাসন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ২০ কোটি ৪২ লাখ ৯২ হাজার টাকা।

সূত্র: ডেইলি স্টার; ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১

দরিদ্রদের তালিকা চূড়ান্ত করতেই পাঁচ বছর পার

করোনা মহামারির আগে দেশে দরিদ্রের হার ছিল ২০ শতাংশ। করোনাকালে সরকারি হিসাবেই তা বেড়ে হয়েছে ২৫ শতাংশ। সে অনুযায়ী দেশে এখন দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। কিন্তু এর পরও ১০ টাকা কেজিতে চাল দেওয়ার জন্য মাত্র ৪৭ হাজার দরিদ্র পরিবার 'খুঁজে পাচ্ছেন না' সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা। তাই ৫০ লাখ দরিদ্র পরিবারের তালিকা পাঁচ বছরেও শেষ হয়নি। এখন পর্যন্ত ওই তালিকায় নাম উঠেছে ৪৯ লাখ ৫৩ হাজার ৩৮৫ পরিবারের।

খাদ্য অধিদপ্তরের ভাষ্য, নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার পরও মাঠ পর্যায় থেকে দরিদ্র ব্যক্তিদের তালিকা পাওয়া যাচ্ছে না। পছন্দের ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত করতে জনপ্রতিনিধিরা এ কাজে বিলম্ব করছেন, আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ইউএনওরা অতিরিক্ত সময় পার করছেন। এর ফলে সরকারের অনুমোদন থাকার পরও সুবিধাবঞ্চিত রয়েছে ২২৪ উপজেলার ৪৬ হাজার ৬১৫টি দরিদ্র পরিবার।

১০ টাকা কেজিতে চাল দেওয়ার কর্মসূচিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা করা কর্মসূচি। স্লোগান- 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ'। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী কুড়িগ্রামে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। কর্মসূচির জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে এবং ইউনিয়নে ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিটি আছে। তারাই হতদরিদ্র পরিবারের তালিকা করে কার্ড দেন।

এ কর্মসূচির উপজেলা কমিটির সভাপতি ইউএনও। গত কয়েক দিনে এ বিষয়ে প্রায় ৫০ জন ইউএনওর সঙ্গে কথা বলা হয়। এর মধ্যে ২০ জন বলেন, তালিকাভুক্ত করতে কতজন বাকি আছে, বিষয়টি তাদের জানা নেই।

যে ২২৪ উপজেলায় দরিদ্র পরিবার 'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না', তার মধ্যে রয়েছে জামালপুরের নদীভাঙন প্রবণ উপজেলা বকশীগঞ্জ, মাদারগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ। মাদারগঞ্জের ইউএনও জানান, নতুন করে দরিদ্রদের তালিকাভুক্ত করতে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত হালনাগাদ না হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, মে মাসের ১৮ তারিখে তিনি যোগদান করেছেন। এর আগের কর্মকর্তারা হয়তো নিয়মিত হালনাগাদ করেননি।

বকশীগঞ্জের ইউএনও মুনমুন জাহান লিজা বলেন, 'কিছু দরিদ্রকে নতুন করে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। তবে কতজন তালিকাভুক্ত করা

বাকি; এ বিষয়টি আমার জানা নেই।' একইভাবে দেওয়ানগঞ্জের ইউএনও এ.কে.এম. আব্দুল্লাহ বিন রশিদ বলেন, তালিকাভুক্ত করা কতজন বাকি; তা জানা নেই।

বকশীগঞ্জের মেরুরচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গাজী মো. জাহিদুল ইসলাম জেহাদ সমকালকে বলেন, তার ইউনিয়নে ১১৯ জন দরিদ্র তালিকাভুক্ত হওয়া বাকি। এ জন্য নতুন তালিকা তৈরির বিষয়ে ১৫ দিন আগে তিনি ইউএনও অফিস থেকে চিঠি পেয়েছেন। তবে তার নদীভাঙন এলাকায় কার্ড পাওয়ার মতো প্রায় তিন হাজার মানুষ আছে। অনেক বেশি দরিদ্র থাকায় তালিকা যাচাই-বাছাই করতে সময় লাগছে।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সন্ধ্যানী স্কুলপাড়া গ্রামের জামেলা খাতুন জানান, তার স্বামী মারা যাওয়ার পর পাঁচজনের সংসার তাকে পরিচালনা করতে হচ্ছে। বড় সংসার নিয়ে তিনি চরম কষ্টে দিন পার করছেন। সরকারের খাদ্য সহায়তা পাওয়ার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করার পরও তিনি কোনো সহায়তা পাননি।

গাংনী উপজেলায় তালিকাভুক্ত হওয়া বাকি ৮৬৩টি দরিদ্র পরিবার। কুড়িগ্রামের চর রাজীবপুর উপজেলার করাতিপাড়া গ্রামের ভূমিহীন দিনমজুর মোজাম্মেল হক বলেন, চার সন্তান, বৃদ্ধ মাসহ আটজনের সংসার নিয়ে চরম কষ্টে দিন পার করছেন। তার পরও করোনাকালে সরকারের সহায়তা পাইনি। এ উপজেলায় তালিকাভুক্তির অনুমোদন আছে ৫৬৫টি দরিদ্র পরিবারের।

বছরের মার্চ, এপ্রিল, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর- এই পাঁচ মাস ১০ টাকা কেজিতে দরিদ্রদের চাল দেওয়া হয়। এই পাঁচ মাস পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল ১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয়। এতে প্রতি মাসে দেড় লাখ টন চাল বিক্রি করা হয়। এ হিসাবে গত পাঁচ বছরে ২৫ মাস এ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। চাল বিতরণ হয়েছে প্রায় সাড়ে ৩৭ লাখ টন।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানম বলেন, গত বছর করোনার শুরুতে যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে অনেক মানুষের নাম বাদ পড়েছে। তাদের স্থলে নতুন দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে। এ জন্য সেপ্টম্বরের মধ্যে তালিকাভুক্ত করে চাল বিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

তালিকা থেকে কেউ বাদ গেলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যক্তিকে তালিকাভুক্ত করার কথা বলা আছে নীতিমালায় এ বিষয়ে সচিব বলেন, দরিদ্রদের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া অনেক কঠিন কাজ। প্রকৃত দরিদ্ররা তালিকাভুক্ত না হলে আবার সমালোচনা হবে। এ জন্য হয়তো সময় লাগছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ২২৪ উপজেলার ৪৬ হাজার ৬১৫ উপকারভোগীকে ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তালিকাভুক্ত করতে গত ১৯ আগস্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের চিঠি দিয়েছিল খাদ্য অধিদপ্তর। এর পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা ইউপি চেয়ারম্যানদের চিঠি দেন। কিন্তু তালিকাভুক্তির কাজ বেশিরভাগ উপজেলায় শুরুই হয়নি। পরে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। এর পরও খাদ্য অধিদপ্তরে তালিকা পাঠানো হয়নি। এখন পুরো সেপ্টেম্বর জুড়ে এ কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছে অধিদপ্তর।

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, সারাদেশে দরিদ্রদের ইউনিয়ন ভিত্তিক তালিকা তৈরি করতে হবে। এর পর কোনো কর্মসূচি চালু হলে তালিকা অনুযায়ী সুবিধা পাবে। ডিজিটাল তালিকা করলে প্রতি মুহূর্তে উপকারভোগীদের যোজন-বিয়োজন করা সম্ভব। এতে কোটি কোটি গরিব মানুষের দেশে সরকারি সুবিধার অনুমোদন থাকার পরও আর কেউ বঞ্চিত হবে না। কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ে দরিদ্রদের তালিকা না থাকায় যখন কোনো কর্মসূচি শুরু হয় তখন দরিদ্র মানুষ খুঁজতে হয়। এতে অনেক সময় একই ব্যক্তি একাধিক সুবিধা পাচ্ছে। যারা পাওয়ার যোগ্য নয় তারাও কম টাকায় চাল পাচ্ছে। এতে প্রকৃত দরিদ্ররা সুবিধাবঞ্চিত হচ্ছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির নীতিমালায় দরিদ্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- 'গ্রামে বসবাসরত সবচেয়ে হতদরিদ্র পরিবার: যেমন- ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, ভিক্ষুকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নারীপ্রধান পরিবার ও যেসব পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে তারা অগ্রাধিকার পাবে।'

এ রকম দরিদ্রদের তালিকা করার উদ্দেশ্যে 'ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ পভার্টি ডাটাবেজ' নামে একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদন করা হয় ২০১৩ সালে। পরে প্রকল্পের নতুন নামকরণ হয় এনএইচডি-'ন্যাশনাল হাউসহোল্ড ডাটা'। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ব্যয় বেড়েছে ৪ গুণ। সময় গেছে আট বছর। তারপরও দেশে দরিদ্রের চূড়ান্ত তালিকা করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক মো. আনিসুজ্জামান বলেন, দরিদ্রদের তালিকা চূড়ান্ত করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত চাপ দেওয়া হচ্ছে। যারা তালিকা দিতে পারেননি তারা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়েছেন। খাদ্য বিভাগও সেপ্টেম্বরের মধ্যে তালিকা চূড়ান্ত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। এর মধ্যে না হলে বুঝতে হবে, অন্য কোনো সমস্যা আছে। তখন সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঢাকা বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক তপন কুমার দাস বলেন, দরিদ্রদের তালিকা করে ইউনিয়ন ও উপজেলা কমিটি। তারা খাদ্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণে বাইরে। তাই তালিকা তৈরির জন্য তাদের চাপ দেওয়া যায় না। তারা তালিকা দেওয়ার পরই চাল সরবরাহ করা হয়।

সূত্র: সমকাল; ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

আইএলওর প্রতিবেদন

অর্ধেক মানুষের কাজের সঙ্গে শিক্ষার অমিল

যথাযথ দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার কারণে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির ৯ দশমিক ৯ শতাংশকে ঠিকঠাক কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আর দেশের শ্রমশক্তির মাত্র ৬ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত। নারীদের মধ্যে এই হার মাত্র ৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

অন্যদিকে দেশে ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি কাজে নিয়োজিত আছেন, এমন মানুষের সংখ্যা শ্রমশক্তির ৮ দশমিক ৩ শতাংশ, যদিও উচ্চশিক্ষিত কর্মীর অনুপাত এর চেয়ে কম। অর্থাৎ দেশে যাঁরা উচ্চ দক্ষতার কাজ করছেন, তাঁদেরও বড় একটি অংশের যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। আর উচ্চ দক্ষতার কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গে নিম্ন দক্ষতার কর্মীদের মজুরির পার্থক্য অনেক বেশি।

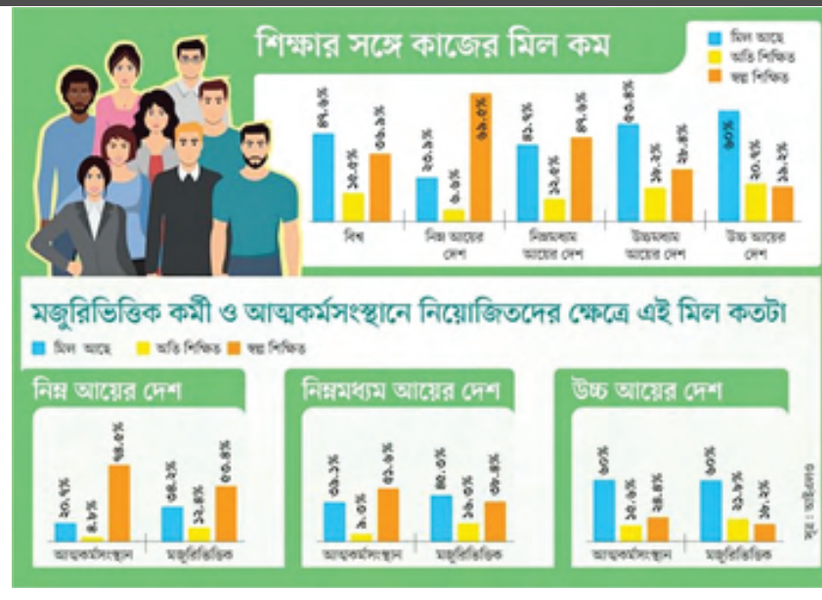

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ এমন কাজ করছেন, যার সঙ্গে শিক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেশে বাংলায় স্নাতক সম্পন্ন করে ব্যাংকে চাকরি করেন, এমন মানুষ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। তবে এই প্রবণতা কেবল দেশই নয়, সারা বিশ্বেই আছে।

আবার নিয়োগদাতাদের অভিযোগের শেষ নেই, যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কাজের জগতের সঙ্গে শিক্ষার জগতের ফারাক চোখে পড়ার মতো। এই বাস্তবতায় ১৩০টি দেশের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে আইএলও জানিয়েছে, বিশ্বের মাত্র অর্ধেক শ্রমশক্তি শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চাকরি করছেন। বাকিরা হয় অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে নিম্ন দক্ষতার চাকরি করছেন অথবা যে কাজ করছেন, তার জন্য যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁদের নেই।

উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে মানুষ সাধারণত শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করে থাকেন। সেখানে শ্রমশক্তির অন্তত ৬০ ভাগের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। উচ্চমধ্যম ও নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ৫২ ও ৪৩ শতাংশ। আর নিম্ন আয়ের দেশে এই হার মাত্র ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, একটি দেশ যত উন্নত হয়, ততই শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সামঞ্জস্যতার হার বাড়তে থাকে।

সব দেশেই অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ দেখা যায়। তবে সব দেশে একই হারে এঁদের দেখা যায় না, নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ বেশি পাওয়া যায় নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে, যেখানে উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ বেশি।

উচ্চ ও উচ্চমধ্যম আয়ের দেশগুলোতে প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন, অর্থাৎ তাঁরা যে কাজ করেন, তার চেয়ে বেশি যোগ্যতা আছে তাঁদের। নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই হার দাঁড়ায় ১২ দশমিক ৫ শতাংশ এবং নিম্ন আয়ের দেশে তা ১০ শতাংশ। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার বেশি। স্বাভাবিকভাবে সেখানে অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত যোগ্যতার ব্যাপারটা সব সময় কম-বেশি থাকবে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, অনেক মানুষ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাপ নিতে চান না বা জীবন ও কাজের মধ্যে ভারসাম্যটা জীবনের দিকে বেশি রাখতে চান বা মোদ্দা কথায় নির্ভার জীবন যাপন করতে চান, তাঁরা কম যোগ্যতার চেয়ে কম ভারের চাকরি করতে চান। আবার অনেকে অভিজ্ঞতার অভাবে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভালো চাকরি করতে পারেন না। তবে এঁদের বেলায় অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সাময়িক ব্যাপার।

বাজারের অসম্পূর্ণতার কারণে এটি ঘটলে ব্যাপারটা দীর্ঘমেয়াদি হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বাজারে চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও যখন উচ্চশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি

হয়।

মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশেও নিম্ন যোগ্যতার সমস্যা আছে। তবে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতেই এদের সংখ্যা বেশি। এসব দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ কর্মী যোগ্যতার চেয়ে উচ্চতর কাজ করেন। নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে এই হার ৪৬ শতাংশ এবং উচ্চ ও মধ্যম আয়ের দেশে তা ২০ শতাংশ। মূলত শিক্ষাজীবনে শিক্ষণ যথাযথভাবে না হওয়া বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে এমনটা ঘটে। আবার কাজের মধ্য দিয়ে অনেকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা রপ্ত করে উঠতে পারেন-অভিজ্ঞতা, স্বশিক্ষণ ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতেও তা হতে পারে।

কাজ ও শিক্ষার সমন্বয়ের প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সায়েমা হক বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে শ্রমবাজারের চাহিদার সঠিক সমন্বয়ের ব্যাপারটি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিল্পকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকে শিক্ষার্থীরা ইন্টার্নশিপ করতে পারে। এমনকি সেখানে স্বল্পমেয়াদে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ স্থাপন সম্ভব। এ ছাড়া শ্রমঘন শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে নতুন নতুন খাতে প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে।

বিশ্লেষকেরা বলেন, অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর, উৎপাদন শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার, যান্ত্রিকীকরন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কেন্দ্র করে কাজের ধরন বদলে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণভিত্তিক, আন্তব্যক্তিক ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কর্মসূচির দিকে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

সূত্র: প্রথম আলো; ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ওয়েবসাইট উদ্বোধন
১১ বিষয়ে তথ্য পাবেন ব্যবহারকারীরা

শ্রম অধিদপ্তরের কার্যক্রম গতিশীল, স্বচ্ছ ও সহজ করতে এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের সমাহারে যাত্রা শুরু হলো ওয়েবসাইট 'পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইস'-এর। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তর এই ওয়েবসাইটটি তৈরি করেছে। এতে ১১টি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাবেন ব্যবহারকারীরা। এগুলো হলো, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য, ট্রেড ইউনিয়ন প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত তথ্য, নথিজাত সংক্রান্ত তথ্য, সেক্টরভিত্তিক ফেডারেশন নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য, জাতীয় ফেডারেশন সংক্রান্ত তথ্য, কনফেডারেশন নিবন্ধন সংক্রান্ত, ট্রেড ইউনিয়ন মামলা সংক্রান্ত তথ্য, সালিসি সংক্রান্ত তথ্য, সিবিএ নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য, অসৎ শ্রম আচরণ/অ্যান্টি ইউনিয়ন ডিস্ক্রিমিনেশন এবং অংশগ্রহণকারী কমিটি সংক্রান্ত তথ্য।

৩০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শ্রম ভবনে এর উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সহজে জানতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ব্যবহারকারীকে শম অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (http://dol.gov.bd) এ যেতে হবে। শ্রম অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের চাহিদা ও সুপারিশের আলোকে এই সফটওয়্যারটি তৈরি করা হয়। সোশ্যাল ডায়ালগ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনের (এসডিআই) এই কম্পোনেন্টের একটি অংশ থেকে এই কর্মসূচির জন্য অর্থায়ন করা হয়। পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইসের সুবিধা তুলে ধরে এর কারিগরি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান ইনোভেক্স আইডিয়া সলিউশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, 'সেবা সহজীকরণ, সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা আনায়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত

যাবতীয় তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য করতে অনলাইনভিত্তিক ডাটাবেইস অধিদপ্তরের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ।' পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইসটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত এবং যে কেউ এখানকার তথ্য বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক, গবেষণামূলক ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। ডাটাবেইসে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্তগুলোর পরিসংখ্যান এমনভাবে গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন একজন ব্যবহারকারী এখান থেকে খুব সহজেই একনজরে সব তথ্যের ধারণা পেতে পারেন।

পাবলিকলি এক্সেসিবল ডাটাবেইসের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'জনসাধারণের এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহারের জন্য এটি একটি অনন্য এবং বিস্তৃত ডাটাবেইস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। কাস্টমাইজড রিপোর্ট তৈরির সুবিধাসহ ব্যবহারকারী ডাটাবেইস থেকে যেকোনো তথ্য দেখতে, ডাউনলোড এবং প্রিন্ট করতে পারবেন। সফটওয়্যারটি যেকোনো প্ল্যাটফর্ম ও ব্রাউজার থেকে এক্সেসযোগ্য এবং সিস্টেমটিতে রয়েছে সুসংহত ডাটা সুরক্ষার ব্যবস্থা।'

অনুষ্ঠানে শ্রম অধিদপ্তরের সারা বছরের কার্যক্রম নিয়ে সংকলিত বাংলাদেশ লেবার জার্নাল ও ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী, আইএলও প্রতিনিধি, শ্রমিক নেতা এবং বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ প্রতিনিধিরা।

সূত্র: কালের কণ্ঠ, ১ অক্টোবর ২০২১

ব্যক্তিমালিকানাধীন পাট শিল্প
নিম্নতম মজুরি ৮০% বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করার সুপারিশ

ব্যক্তিমালিকানাধীন পাট শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি কাঠামো সর্বশেষ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০১৩ সালে। এরপর তা আবারো পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয়া হয় ২০১৯ সালের জুনে। কভিডের অভিঘাতে এ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলেও অবশেষে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পাটকল শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চলমান কাঠামোর চেয়ে ৮০ শতাংশ বাড়িয়ে মাসে ৮ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড।

২০১৯ সালের জুনে ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হার পর্যালোচনায় গঠিত বোর্ডে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির নাম ঘোষণা করে সরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষ মজুরি নিয়ে দরকষাকষির প্রস্তুতি নেয়। ব্যক্তি খাতের পাটকল শ্রমিক প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) অধীনস্থ পাটকল শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত কাঠামোর চেয়ে বেশি মজুরি প্রস্তাবের জন্য মনস্থির করেছিলেন।

জানা গেছে, মজুরি বোর্ডে ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকলের শ্রমিক প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে দেয়া প্রথম প্রস্তাব ছিল ১৫ হাজার টাকা নির্ধারণের। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দীর্ঘ আলোচনা শেষে শ্রমিক প্রতিনিধিরা ১০ হাজার টাকায় নেমে আসেন। পরবর্তী সময়ে দেশের সবচেয়ে শ্রমঘন পোশাক শিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৮ হাজার টাকা নির্ধারণে সম্মত হয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো।

সব পক্ষের এ-সংক্রান্ত মতামতের ভিত্তিতে নতুন কাঠামোর সুপারিশ করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অধীনস্থ নিম্নতম মজুরি বোর্ড। এ বিষয়ে কোনো পক্ষের আপত্তি বা সুপারিশ থাকলে তা প্রজ্ঞাপন প্রকাশের দিন থেকে পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে লিখিত আকারে মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো আপত্তি বা সুপারিশ না থাকলে খসড়া সুপারিশ চূড়ান্ত করে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে বোর্ড জানিয়েছে।

১২ অক্টোবর চূড়ান্ত হওয়া মজুরি বোর্ডের এ সুপারিশ প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ পেয়েছে ১৮ অক্টোবর। সেখানে দেখা গেছে, সর্বনিম্ন গ্রেডের শ্রমিকদের মূল মজুরি নির্ধারণ হয়েছে ৫ হাজার টাকা। এর ৪০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়ার পরিমাণ ২ হাজার টাকা। এছাড়া চিকিৎসা ভাতা ও যাতায়াত ভাতা যথাক্রমে ৭০০ ও ৩০০ টাকা। সব মিলিয়ে সর্বনিম্ন মোট মজুরি দাঁড়াচ্ছে ৮ হাজার টাকায়, যা সর্বশেষ কাঠামোর নিম্নতম মোট মজুরির চেয়ে ৮০ শতাংশ বেশি।

ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকলের মজুরি কাঠামো সর্বশেষ পর্যালোচনা হয় ২০১৩ সালে। সে বছর নির্ধারিত কাঠামোর সর্বনিম্ন গ্রেডে শ্রমিকের মূল মজুরি ধরা হয় ২ হাজার ৭০০ টাকা। এছাড়া বাড়িভাড়া ১ হাজার ৮০ টাকা, চিকিৎসা ৪০০ ও যাতায়াত ২০০ টাকা ভাতাসহ নিম্নতম মোট মজুরির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ হাজার ৩৮০ টাকায়।

২০১৯ সালের ১৩ জুন এক প্রজ্ঞাপনে ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল মালিক প্রতিনিধি হিসেবে রাজবাড়ী জুট মিলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীন এবং শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে মহসেন জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্য মো: শহীদুল্লাহ খাঁ'র নাম ঘোষণা করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

জানতে চাইলে রাজবাড়ী জুট মিলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেখ সামসুল আবেদীন বলেন, দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে নিম্নতম মজুরি কাঠামোর চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। কভিড মহামারীসহ নানা কারণে নতুন মজুরি হার বাস্তবায়নে বেগ পেতে হবে শিল্প মালিকদের। তার পরও সার্বিক দিক বিবেচনায় পোশাক খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চূড়ান্ত সুপারিশে সম্মত হয়েছেন বোর্ড সদস্যরা।

মজুরি বোর্ডের সদস্য ও শ্রমিক প্রতিনিধি মো. শহীদুল্লাহ খাঁ বলেন, বিদ্যমান মজুরি কাঠামো বর্তমান চাহিদার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের দাবি ছিল মূল মজুরি ৮ হাজার ৩০০ টাকা করার। কিন্তু মজুরি বোর্ডে সংশ্লিষ্ট সবাই মালিকদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাই এখন মূল মজুরি ৪ হাজার ৩৮০ থেকে ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বোর্ডের আগামী সভায় নতুন কাঠামোর বিষয়ে আমাদের আপত্তি লিখিতভাবে জানানো হবে।

পাটকল মালিক প্রতিনিধিরা বলছেন, শ্রমিকপক্ষ যতটা প্রস্তাব করবে, ততটা দেয়ার সক্ষমতা এ শিল্পের মালিকদের বর্তমানে আছে কিনা সেগুলো যাচাই করেই চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমানে শিল্প সক্ষমতা অনেক দুর্বল।

জানা গেছে, দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট পাটকল ইউনিটের সংখ্যা প্রায় ৩০০। এর মধ্যে ব্যক্তি বা বেসরকারি খাতে বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজেএসএ) ও বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএমএ) সদস্য সক্রিয় পাটকল ইউনিট আছে প্রায় ২৪০টি। মিলগুলোয় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ১ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি।

সূত্র: বণিক বার্তা; ২৮ অক্টোবর ২০২১

বৈদেশিক কর্মসংস্থান
সংকুচিত হয়ে পড়ছে বিদেশের শ্রমবাজার

সংকুচিত হয়ে পড়ছে বিদেশের শ্রমবাজার। একাধিক বড় শ্রমবাজার বন্ধ। এর মধ্যে বাড়ছে সৌদি আরব নির্ভরতা। এ বছরের প্রথম আট মাসে বিদেশে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে ৭৮ শতাংশের বেশি গেছেন ওই দেশে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৫ সাল থেকে গত আগস্ট পর্যন্ত কাজ নিয়ে বিভিন্ন দেশে গেছেন প্রায় ১ কোটি ৩৩ লাখ মানুষ। এর মধ্যে ৩৩ শতাংশই গেছেন সৌদি আরব।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, পুরোনো শ্রমবাজারে মন্দা ও নতুন শ্রমবাজার তৈরি করতে না পারায় চার বছর ধরে বিদেশে কর্মী পাঠানো কমছে। এর মধ্যে অতিমারি করোনার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি কমেছে গত দুই বছরে। ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করেছে প্রবাসী আয়, সামনে এটি আরও কমতে পারে।

বেসরকারি খাতে বিদেশে কর্মী পাঠানো রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বায়রা ও রিক্রুটিং এজেন্সি ঐক্য পরিষদ (রোয়াব) বলছে, একক শ্রমবাজার হিসেবে সৌদি আরবই এখন

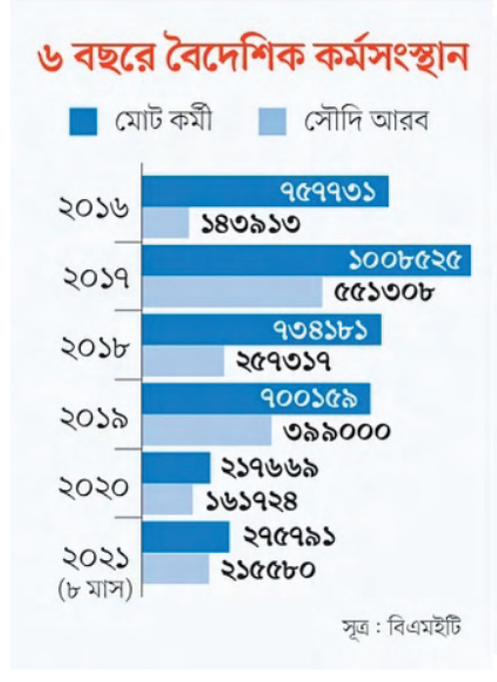

ভরসা। কিন্তু গত দুই বছরে সেখানেও আসছে নানা প্রতিবন্ধকতা। দেশটি থেকে নিয়মিত চাহিদা আসছে। কিন্তু দূতাবাসের বিধিনিষেধের কারণে ভিসা করা যাচ্ছে না। আরও বেশি কর্মী পাঠানোর সুযোগ ছিল দেশটিতে। এখন দুই ডোজ টিকা ছাড়া নারী কর্মীদের নিতে রাজি হচ্ছে না দেশটির এজেন্সিগুলো।

বিএমইটির তথ্য বলছে, বছরে রেকর্ড ১০ লাখের বেশি কর্মী বিদেশে যান ২০১৭ সালে। এরপর ২০১৮ সালে এটি কমে দাঁড়ায় ৭ লাখ ৩৪ হাজারে। ২০১৯ সালেও বিদেশে যান ৭ লাখ কর্মী। এরপর করোনার প্রভাবে ব্যাপক ধস নামে ২০২০ সালে। বিভিন্ন দেশে যান মাত্র ২ লাখ ১৭ হাজার ৬৬৯ জন। আর এ বছরের প্রথম আট মাসে গেছেন ২ লাখ ৭৫ হাজার ৭৯১ জন। এর মধ্যে গত বছর ৭৪ শতাংশ এবং এ বছর ৭৮ শতাংশ কর্মী গেছেন সৌদি আরবে।

বড় দুই শ্রমবাজার বন্ধ: বিএমইটি ও বায়রার দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, বড় শ্রমবাজারগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া বন্ধ আছে তিন বছর ধরে। দুর্নীতির অভিযোগে এটি বন্ধ হয়ে যায় ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে। এরপর দুই দেশের প্রতিনিধিরা দফায় দফায় বৈঠক করেও শ্রমবাজার চালুর বিষয়ে সুরাহা করতে পারেনি।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে আছে দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার সংযুক্ত আরব আমিরাত। গত বছর এটি চালুর ঘোষণা হলেও করোনার প্রভাবে তেমন গতি পায়নি। গত বছর দেশটিতে গেছেন মাত্র ১ হাজার ৮২ কর্মী। আর এ বছর গেছেন ৪ হাজার ৬৯০ জন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, করোনার প্রভাবে কুয়েত, জর্ডান, বাহরাইন, লেবাননে কর্মী যাচ্ছেন হাতে গোনা। জর্ডানেও কর্মী পাঠানো অনেক কমে গেছে। নতুন শ্রমবাজারে কর্মী যাচ্ছেন নামমাত্র সংখ্যায়।

বায়রার সাবেক মহাসচিব শামীম আহমেদ চৌধুরী বলেন, অভিবাসন বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বড় খাত। অথচ এটিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। শুধু প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের চেষ্টায় তো হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় মিলে একটি সমন্বয় সেল করা দরকার ছিল। মহামারির সময়ে কর্মী পাঠানো বাড়াতে আরও আগে থেকেই উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল।

জানতে চাইলে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, বন্ধ শ্রমবাজার চালু করায় জোর দেওয়া হচ্ছে। মালয়েশিয়া চালু করতে আলোচনা চলছে। অপ্রচলিত বাজার পূর্ব ইউরোপে কর্মী যাচ্ছেন। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে শ্রমবাজার আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে।

প্রবাসী আয় কমছে: বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, করোনার শুরু থেকেই প্রবাসী আয় বাড়তে শুরু করে। তবে টানা তিন মাস ধরে এটি কমতে শুরু করেছে। গত বছরের আগস্টে এসেছিল ১৯৬ কোটি ডলারের প্রবাসী আয়। এবার আগস্টে ১৮১ কোটি মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এর আগে জুলাইয়ে ১৮৭ কোটি ডলার ও জুনে ১৯৪ কোটি ডলার পাঠান প্রবাসীরা। ওই দুই মাসেও আগের বছরের চেয়ে কম এসেছে। সামনে এটি আরও কমবে বলে শঙ্কা আছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, করোনার মধ্যে সবার আয় কমলেও দেশে বৈধ পথে প্রবাসী আয় বেড়েছিল। অনিশ্চয়তা থেকে জমানো টাকা অনেকে দেশে পাঠিয়ে দেন। ওই সময় হুন্ডি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আকাশপথে যোগাযোগ চালুর পর এটি আবার শুরু হয়েছে। গত দুই বছরে প্রায় পাঁচ লাখ কর্মী ফিরে এসেছেন। এর মধ্যে কেউ কেউ ফিরে গেলেও বড় অংশ দেশে রয়ে গেছেন।

সূত্র: প্রথম আলো; ০৭ অক্টোবর ২০২১

কর্মসংস্থানের গতি শ্লথ, কমেছে বিনিয়োগ

গত প্রায় দেড় বছর ধরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত হওয়ায় দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। আলোচ্য সময়ে শ্রম বাজারে নতুন আসা কর্মীদের যেমন চাকরির সংস্থান হয়নি, তেমনি আগের চাকরিজীবীদের অনেকে কর্মচ্যুত হয়েছেন। সব মিলিয়ে বেকারত্বের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৩ লাখ। এদের কর্মসংস্থানের জন্য যেভাবে বিনিয়োগ দরকার সেভাবে বিনিয়োগ বাড়ছে না। চাঙ্গা হচ্ছে না বেসরকারি খাতও।

এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম খান বলেন, কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানো হচ্ছে, প্রবাসীদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে। শিল্প, কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ বাড়ানো হচ্ছে। এসব পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে আগামী জুনের মধ্যেই যারা চাকরি হারিয়েছেন তারা আগের কাজ ফিরে পাবেন। একই সঙ্গে নতুন কর্মসংস্থানও স্বাভাবিক মাত্রায় হতে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বাড়ানোর নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এতে আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যেই অর্থনীতিতে আরও গতি বাড়বে। ইতোমধ্যে অর্থনীতির সূচকগুলোর মধ্যে আমদানি, রপ্তানি বাড়তে শুরু

করেছে। এর প্রভাব সব খাতেই পড়বে।

গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংক সহযোগী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার কারণে অর্থনীতি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে। করোনার আর যদি নতুন কোনো আঘাত না আসে তবে ২০২৩ সালের মধ্যে অর্থনীতি গতিশীল হবে। এর আগে হবে না। আর নতুন করে করোনার আঘাত এলে অর্থনীতিতে গতি আসতে আরও বেশি সময় লাগবে। কেননা বেসরকারি খাত এখনো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তবে বাণিজ্য ও সেবা খাত স্বল্প পরিসরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। মৌলিক শিল্প খাতে এখনো আস্থাহীনতা বিদ্যমান। কেননা, করোনায় যেভাবে মানুষের আয় কমেছে, এখন তা বেড়ে আগের পর্যায়ে যায়নি।

সরকার করোনার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা করতে দুই দফায় প্রণোদনা প্যাকেজের আকার বাড়িয়ে ১ লাখ ৮৭ হাজার কোটি টাকা করেছে। প্রণোদনার কারণে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

গত ৩ অক্টোবর প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনায় যেভাবে অর্থনীতিতে আঘাত আনার কথা সেভাবে আনতে পারেনি। সরকারের বহুমুখী তৎপরতার মাধ্যমে একদিকে যেমন শিল্প ও কৃষি খাতে কম সুদে ও সহজ শর্তে চলতি মূলধন, মেয়াদি ঋণের জোগান দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ বাড়িয়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। তবে করোনাকালীন সময়ে নতুন বিনিয়োগ কম হয়েছে।

এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ও ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, বেশি কর্মসংস্থান হয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। সরকার এখন পর্যন্ত বড়দের নিয়েই বেশি কাজ করছে। কিন্তু ছোটরা ঋণ পাচ্ছে না। তাদের জন্য তহবিল বরাদ্দ করা হলেও তারা ব্যাংকে পৌঁছতে পারছে না। ছোট খাতকে ঋণ দিয়ে চাঙ্গা করা গেলে এর ইতিবাচক প্রভাব সব খাতে পড়বে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের মোট জনশক্তি ১৬ কোটি ৮২ লাখ। এর মধ্যে কর্ম উপযোগী মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৯১ লাখ। কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন ৬ কোটি ৮ লাখ মানুষ। বাকি ৪ কোটি ১১ লাখ কর্মের বাইরে রয়েছেন। যারা কর্মে আছেন, তাদের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত ২ কোটি ৪৭ লাখ। এদের বেশির ভাগই সারা বছর কাজ পান না।

শিল্পে নিয়োজিত ১ কোটি ২৪ লাখ এবং সেবা খাতে নিয়োজিত ২ কোটি ৩৭ লাখ। করোনার এই তিনটি খাতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি খাতের শ্রমিকরা নিজ কর্মে মৌসুমি ভিত্তিতে ফিরে যেতে পারলেও সেবা ও শিল্প খাতের কর্মীরা সবাই কাজে ফিরে যেতে পারেননি।

বিভিন্ন সংখ্যার জরিপে বলা হয়েছে, বড় শিল্প ও সেবা খাতে কাজ সংখ্যা কম হলেও কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, ও মাঝারি শিল্প খাতের

প্রায় ৩৬ শতাংশ কর্মী কাজ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ১৮ শতাংশ কাজে ফিরে যেতে পেরেছেন। বাকি ১৮ শতাংশ এখনো কাজ ফিরে পাননি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মতে, বাংলাদেশে করোনায় ১৬ লাখ ৭৫ হাজার কর্মী কাজ হারিয়েছেন। বিবিএসের হিসাবে প্রতি বছর গড়ে শ্রমের বাজারে যুক্ত হচ্ছে ২৪ লাখ ৩৪ হাজার মানুষ। এ হিসাবে গড়ে দেড় বছরে শ্রমের বাজারে নতুন এসেছেন সাড়ে ৩৬ লাখ কর্মী। যাদের বেশির ভাগের পক্ষেই কর্মের সংস্থান করা সম্ভব হয়নি। কেননা করোনার কারণে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ যেমন কম হয়েছে, তেমনি সেরকারি খাতে নিয়োগ হয়নি বললেই চলে। ফলে ওই সাড়ে ৩৬ লাখের বেশির ভাগই বেকার। এছাড়া নতুন করে কাজ হারানোর তালিকায় আছেন ১৬ লাখ ৭৫ হাজার। এ দুটি মিলে শুধু করোনাকালীন সময়ে দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৫৩ লাখ।

বিবিএসের হিসাবে প্রতি বছর কর্মের বাজারে আসে ২৪ লাখের বেশি কর্মী। এর মধ্যে কাজের সংস্থান করতে পারেন মাত্র ৬ লাখ কর্মী। বাকি ১৮ লাখের মধ্যে কিছু নিজ উদ্যোগে ব্যবসা বাণিজ্য করেন। বাকিদের সামান্য অংশ বিদেশে যায়। আর সবই বেকার থাকে। এভাবে প্রতি বছরই বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। এ হিসাবে দেশে বেকারের সংখ্যা ৩ থেকে সাড়ে ৩ কোটির বেশি হবে।

আইএলও'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। করোনার কারণে তা দ্বিগুণ হয়ে ৬ কোটিতে দাঁড়াতে পারে। কেননা আগামী ২০২৩ সাল পর্যন্ত কাজের বাজারে করোনার প্রভাব থাকবে। এর মধ্যে নতুন কাজ মিলবে খুবই কম। বরং কাজ হারানোর সংখ্যা আরও বাড়বে। কমবে নতুন কর্মসংস্থানের হার। বাড়বে দারিদ্র্য।

এদিকে গত ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বিআইডিএস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করা শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি জরিপ করে। গত ১০ সেপ্টেম্বর প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬৬ শতাংশই বেকার। ৭ শতাংশ অন্য শিক্ষা নিচ্ছেন। ৩ শতাংশ নিজ উদ্যোগে কিছু করছেন। গত ডিসেম্বরে প্রকাশিত তাদের অপর এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তরুণদের ৩৩ দশমিক ১৯ শতাংশই বেকার।

বিবিএসের জরিপেও দেখা যায়, দেশে স্নাতক বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। এটি করোনার আগে থেকেই। করোনার কারণে এ খাতে বেকারত্ব আরও বেড়েছে। ২০১৫ সালে স্নাতক বেকার ছিল ৩২ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা বেড়ে ৩৯ শতাংশে, ২০১৭ সালে ৪১ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ৪৩ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০১৯ সালে এ হার আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭ শতাংশে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, করোনার কারণে এখন এ হার ৮০ শতাংশের কাছাকাছি হবে। বিবিএএসের তথ্য থেকে জানা যায়, প্রতি বছর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলে গড়ে সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থী কর্মের বাজারে আসে।

বিশ্বব্যাংক সহযোগী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, করোনার কারণে দেশের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত ৩৭ শতাংশ মানুষ বেকার হয়ে পড়েছেন। বাংলাদেশের মোট জিডিপি প্রায় ২০ শতাংশ আসে এসএমই খাত থেকে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জরিপে বলা হয়, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরুর আগে গত মার্চে নতুন দরিদ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৪৫ লাখ। অর্থাৎ তাদের বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার সামর্থ্য কমেছে।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা ২০১৯ সালে ছিল ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। করোনার কারণে এ হার বেড়ে প্রায় ৪১ শতাংশে চলে যাবে। কাজ হারানো, নতুন কাজের সংস্থান না হওয়া ও আয় কমার কারণে এমনটি হবে।

করোনার ক্ষতি মোকাবিলা করে কর্মসংস্থান বাড়াতে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কর্মসংস্থানের ৮০ শতাংশ হচ্ছে বেসরকারি খাতে, বাকি ২০ শতাংশ সরকারি খাতে। এ কারণে বেসরকারি খাতকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য মুদ্রানীতিতে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাড়ছে না। শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণের হার কমেছে ৬০ শতাংশ। বিদেশি বিনিয়োগ অর্থবছরে কমলেও চলতি অর্থবছরের জুলাই বেড়েছে ৯ কোটি ডলার।

তবে বৈদেশিক ঋণ বাড়ছে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ না বাড়ায় ঋণের চাহিদা বাড়ছে না। এতে নতুন কর্মসংস্থানের গতিও শ্লথ হয়ে পড়েছে। এ খাতে গতি আনতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নতুন উদ্যোক্তা চিহ্নিত করে তাদেরকে ঋণ দিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: যুগান্তর; ০৯ অক্টোবর ২০২১

বিল্‌স সংবাদ

দেশে ফিরে আসা অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিয়ে বিল্‌স এর গবেষণা

বিদেশ থেকে ফিরে আসা নারী শ্রমিকদের অসহায় অবস্থা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন

পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিদেশ গিয়ে ২৩% নারী শ্রমিক এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দেশে ফিরেছেন, ১৮% এক বছরের সামান্য বেশি সময় থেকেছেন, ৫৫% নারী শ্রমিকের দেশে ফেরত আসা ছিল জবরদস্তিমূলক। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর "দেশে ফিরে আসা অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডিতে বিল্‌স সেমিনার হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিল্‌স গবেষণা বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ মনিরুল ইসলাম। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য সাকিল আখতার চৌধুরী, মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ এবং পূলক রঞ্জন ধর, বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, উপ-পরিচালক এম এ মজিদ প্রমুখ।

বিল্‌স দেশের তিনটি জেলার (চট্টগ্রাম, যশোর এবং ফরিদপুর) ৩২৩ জন প্রত্যাবাসী অভিবাসী নারী শ্রমিকের উপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া, গুণগত গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রাথমিক উৎস্যসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, দেশে ফেরত আসা প্রতি ৩ জন নারী শ্রমিকের মধ্যে ১ জনের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের থেকে অবনতি হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সিংহভাগই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। ৮৫% তাদের বর্তমান কাজ নিয়ে হতাশাগ্রস্ত এবং ৫৭% তাদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে চিন্তিত।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৫২% বিদেশে জবরদস্তিমূলক শ্রমের শিকার হয়েছেন, ৬১% বিদেশে খাদ্য ও পানির অভাবে ভুগেছেন, ৭% যৌন এবং ৩৮% শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বিদেশ ফেরত ৬০% নারী শ্রমিক বেকার, ৬৫% শ্রমিকের নিয়মিত মাসিক কোন আয় নেই, ৬১% শ্রমিক এখনও ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন, ৭৫% শ্রমিকের কোন সঞ্চয় নেই এবং ৭৩% শ্রমিক তাদের পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন।

বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকদের শারীরিক স্বাস্থ্যের অবস্থা নাজুক। ৫৫% শ্রমিক শারীরিকভাবে অসুস্থ্য, ২৯% এর মানসিক অসুস্থতা রয়েছে এবং ৮৭% শ্রমিক মানসিক অসুস্থতার কোন চিকিৎসা পায়নি। বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকরা সামাজিকভাবেও হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন। পরিবার ও সমাজ তাদের সাথে বৈরী এবং অমানবিক আচরণ করে। ৩৮% নারী শ্রমিক বলছেন সমাজে তাদের নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রহীন নারী বলে গণ্য করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকরা তাদের পরিবার ও সমাজের কাছে অবহেলিত। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোর মধ্যে তারা নিজেদের অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিয়ে ছিলেন। বর্তমানে বেশীর ভাগেরই পরিবার বা সমাজে মতামতের কোন মূল্য নেই। তাদের কেউ গ্রাহ্য করে না। তাদের কেউ বিশ্বাস করে না। বিদেশ থেকে ফেরার সময় পরিবারের সদস্য দ্বারা বিমানবন্দরেই অযাচিত আচরনের শিকার হয়েছেন ১৭% শ্রমিক। ১৫% বিদেশ থেকে ফিরে আসা নারী শ্রমিক তালাকপ্রাপ্ত হয়েছেন। ১১% নারী শ্রমিকের স্বামী তাদের ছেড়ে চলে গেছে এবং ২৮% নারী শ্রমিক তাদের দাম্পত্য জীবনে বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছেন।

তবে এর ব্যাতিক্রমও রয়েছে। কিছু কিছু বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিক তাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা ভালো পরিবেশে কাজ করে, ভালো পরিমাণে রেমিট্যান্স আয় করেছেন এবং তাদের ভাল সঞ্চয় রয়েছে। তাদের নিয়মিত আয়ের উৎস রয়েছে। তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবেও সুস্থ্য।

সংবাদ সম্মেলনে বিল্‌স নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রত্যাবাসী অসহায় নারী শ্রমিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের বিষয়ে গুরুত্ব নিয়ে কাজ করা দরকার। বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকদের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ এবং এর ধারাবাহিক পর্যালোচনা করা দরকার। এই গবেষণা তার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। গবেষণায় বিদেশ ফেরত

নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের প্রতি বিদ্যমান সামজিক মনোভাব, তাদের পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুর্নবাসনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ তুলে আনা হয়।

বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকদের উন্নয়নে বিল্‌স এর গবেষণায় কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়- প্রত্যাবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত সামজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা; উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া; সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি উপযুক্ত বানিজ্যিক পরামর্শ দেওয়া; মনো-সামাজিক পরামর্শসহ উপযুক্ত স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান; পদ্ধতিগত নিবন্ধন এবং তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া; উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তণ যা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে; সংগঠন, নিবন্ধন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় ট্রেড ইউনিয়নকে সম্পৃক্ত করা এবং ক্রমান্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতি-কাঠামো প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়া। তাছাড়া, নীতি ও আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি বাস্তবায়ন নিরীক্ষা এবং উত্তরণের উপায় শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপনে বিলস এর সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা শহরে কর্মরত গৃহশ্রমিকদের উপর ২০২১ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গৃহশ্রমিকদের গড় মজুরি প্রতি মাসে ৪৫০০ টাকার কিছু বেশী এবং এদের ৯০ শতাংশই ৭০০০ টাকার কম মজুরি পেয়ে থাকেন। তবে যেসব গৃহশ্রমিকের কারিগরী প্রশিক্ষণ রয়েছে তাদের গড় আয় অপ্রশিক্ষিতদের তুলনায় ভাল। নিয়োগকারীর সাথে কোন লিখিত চুক্তি নেই ৯৯ শতাংশের বেশী গৃহশ্রমিকের। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের জন্য কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটিরও ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া অন্ততঃ ২৮.২ শতাংশ গৃহশ্রমিকের মজুরি হ্রাস পেয়েছে কোভিড-১৯ অতিমারী পরিস্থিতির সময়।

অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ ও গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা'র সহায়তায় "সুনীতি" প্রকল্পের আওতায় ২৮৭ জন গৃহশ্রমিকের ওপর "গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি বাস্তবায়ন নিরীক্ষা এবং উত্তরণের উপায়" শীর্ষক এই সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অন্যান্য সংগঠনসমুহের মধ্যে রয়েছে গণসাক্ষরতা অভিযান, হ্যালোটাস্ক, নারী মৈত্রী, রেড অরেঞ্জ ও ইউসেপ বাংলাদেশ। বিল্‌স পরিচালিত এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ ছিলেন অনাবাসিক (লিভ আউট) এবং ৪০ শতাংশ ছিলেন আবাসিক (লিভ ইন) গৃহশ্রমিক। উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ অনুমোদন দেয়। এতে নিয়োগকর্তা, কর্মচারী এবং সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট সংজ্ঞা সহ ১৬ টি বিধান রয়েছে। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র ১৪ শতাংশ গৃহশ্রমিক সরকার ঘোষিত এই নীতি সম্পর্কে জানেন এবং তাদের নিয়োগকারীরা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে, আবাসিক

গৃহশ্রমিকদের মধ্যে ৩৮.৬ শতাংশের বয়সই ১৮ বছরের নীচে । ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ রাজধানীর প্রেসক্লাবে বিল্‌স আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য নইমুল আহসান জুয়েল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী আবুল হোসাইন, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ এর প্রকল্প সমন্বয়কারী গীতা রাণী অধিকারী, গবেষণা পরিচালনাকারী টিমের প্রধান জাকির হোসেন খান সহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংগঠনসমুহের নেতৃবৃন্দ, গৃহশ্রমিক প্রতিনিধি ও মিডিয়াকর্মীবৃন্দ।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, ৭২.২ শতাংশ গৃহশ্রমিকের মজুরি কাজের ধরণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে; এ ছাড়াও কর্মঘন্টার ওপর ভিত্তি করে ৬.১ শতাংশের এবং তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ৮.১ শতাংশের মজুরি নির্ধারিত হয়ে থাকে। আবাসিক গৃহশ্রমিকদের মধ্যে ২০ শতাংশের মজুরি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়; তবে লক্ষণীয় যে, এই সব আবাসিক গৃহশ্রমিকদের মধ্যে ১৩.৬ শতাংশ কোন মজুরি পান না, তারা শুধুমাত্র থাকা ও খাওয়ার বিনিময়ে শ্রম দিয়ে থাকেন। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে,

যে সকল গৃহশ্রমিক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন তাদের গড় আয় অপ্রশিক্ষিতদের তুলনায় ভাল এবং যেসব গৃহশ্রমিক বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা গৃহস্থালি সম্পর্কিত জিনিসের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তারা ৯০০০ টাকার বেশি উপার্জন করেছেন, যেখানে গড় মজুরী ৪৬২৯ টাকা।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, গৃহশ্রমিকদের মাত্র ০.৭ শতাংশের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের সাথে লিখিত চুক্তির কথা জানা যায়। সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, বেশিরভাগ আবাসিক গৃহশ্রমিক (৫১.৩ শতাংশ) তাদের স্বজনদের দ্বারা নিয়োগ পেয়েছেন এবং বেশিরভাগ অনাবাসিক গৃহশ্রমিক (৪৩.৪ শতাংশ) অন্যান্য গৃহশ্রমিকের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন। এ ছাড়াও ৬৪ শতাংশ গৃহশ্রমিকের কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক ছুটি নেই।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, অন্ততঃ ৩১.৫৮ শতাংশ আবাসিক এবং ৩৬.৪২ শতাংশ অনাবাসিক গৃহশ্রমিক বলেছেন, তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক চাপ নিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমুলক শ্রম দিতে হয়েছে। আবাসিক গৃহশ্রমিকদের ৪১.২৩ শতাংশ এবং অনাবাসিকদের ২৪.৮৬ শতাংশ বলেছেন, তারা গালিগালাজের শিকার হয়েছেন। ১৮ বছরের নীচে যাদের বয়স, তাদের ৫০ শতাংশই কোন না কোন ধরণের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। উল্লেখ্য, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ তে উল্লেখ করা হয়েছে, "কোন ক্রমেই গৃহকর্মীর প্রতি কোনো প্রকার অশালীন আচরণ অথবা দৈহিক আঘাত অথবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। তবে দেখা গেছে, গৃহশ্রমিকদের কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের অভিযোগ করার সুযোগ খুবই সীমিত। বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়, আমাদের দেশে গৃহশ্রমিকদের অবদান গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত শ্রমিকরা কল্যাণ তহবিলের পরিধিতে থাকলেও গৃহশ্রমিকদের জন্য এ জাতীয় কোনও সুনির্দিষ্ট তহবিল নেই।

এ গবেষণায়, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ এর মধ্যে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে তা হলো, শ্রম সম্পর্কিত আইন এবং জিডিপি প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে গৃহশ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি না দেওয়া, সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারিত না থাকা, গৃহশ্রমিকদের পদ্ধতিগত পরিসংখ্যানের অনুপস্থিতি, ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি গঠনের বিধানের অভাব, গণমাধ্যমে প্রচার ও নিরক্ষরতার কারণে নীতি সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতার অভাব, হয়রানি, নির্যাতন, জবরদস্তিমুলক শ্রমের জন্য কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিতে নিবন্ধন ও তথ্যের অভাব, মনিটরিং সেলের কার্যকারিতার অভাব এবং সামাজিক অধিকারের অভাব।

যেসসকল বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, গৃহস্থালী কাজকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি পেশা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা, তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান, জাতীয় জরিপে গৃহশ্রমিকদের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া, হয়রানি ও নির্যাতনের অভিযোগ প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও গৃহশ্রমিকদের হেল্পলাইন নম্বর ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা, গৃহশ্রমিকদের জন্য অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন, এতে মহিলা পুলিশদের দায়িত্ব প্রদান ও প্রতিটি ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ান স্টপ-সার্ভিস চালু করা, গৃহশ্রমিকদের বেতন কমপক্ষে গার্মেন্টস খাতের সম পরিমাণ বৃদ্ধি করা, বেতনের ৫০ শতাংশ উৎসব বোনাস প্রদান করা, সরকার কর্তৃক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, গর্ভকালীন সময়কালে এবং সন্তান প্রসবের পর কমপক্ষে ৬ মাসের সবেতন ছুটি প্রদান এবং সরকারি উদ্যোগে গৃহশ্রমিক প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ইত্যাদি। সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, নীতিনির্ধারক এবং ট্রেড ইউনিয়ন একত্রে মিলে সামাজিক সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য সুপারিশ প্রদান করতে পারে। এই সুপারিশগুলির মধ্যে কোভিড-১৯ সংকট এবং গৃহকর্মীদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রত্যাবাসী নারী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অভিবাসন সংশ্লিষ্ট নীতিমালার উপর প্রণীত সুপারিশমালা অনুমোদন শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত

বিলস্ এর উদ্যোগে প্রত্যাবাসী নারী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অভিবাসন সংশ্লিষ্ট নীতিমালার উপর প্রণীত সুপারিশমালা অনুমোদন শীর্ষক সভা ১৪ অক্টোবর ২০২১ বিল্স সেমিনার হল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ।

প্রবাসী শ্রমিক বিশেষ করে প্রত্যাবাসী নারী শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিল্স প্রণীত সুপারিশমালা অনুমোদন করার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

বিল্স ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্স মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক নজরুল ইসলাম খান। আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সভাপতি শাহ মোঃ আবু জাফর, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেসবাহউদ্দিন আহম্মেদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন , বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম, জাতীয় শ্রমিক

জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা এবং সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল, বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি আব্দুল কাদের হাওলাদার, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শামীম আরা, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এম ফয়েজ হোসাইন, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্পাদক পুলক রঞ্জন ধর, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী রহিমা আক্তার সাথী, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য নাসরিন আক্তার ডিনা, বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমীন, উপপরিচালক এম এ মজিদ এবং মোঃ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন ও উন্নয়নে সুপারিশ গ্রহণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন ও উন্নয়নে সুপারিশ গ্রহণ শীর্ষক কর্মশালা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিল্‌স সেমিনার হল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

শোভন কাজের মানদন্ডের আলোকে ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ পর্যালোচনা করে এর ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং উন্নয়নে শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ, বিল্‌স ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের সুপারিশ গ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের করণীয় নির্ধারণ করার লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর এর সভাপতিত্বে এবং বিল্‌স সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য কামরুল আহসান এবং এ এম নাজিম উদ্দিন, বিল্‌স সম্পাদক আব্দুল কাদের হাওলাদার এবং মু. শফর আলী, শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম, বাংলাদেশ লেবার কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি অ্যাডভোকেট সেলিম আহসান খান, টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি তপন দত্ত, বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমীন প্রমুখ।

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের যুবা সংগঠকদের পাঠচক্র অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের যুবা সংগঠকদের পাঠচক্র ১৮ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা আহছানিয়া মিশন কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক আন্দোলনে দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠক তৈরি, যারা স্ব স্ব সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখার মাধ্যমে সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে এ পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়।

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী আবুল হোসাইন, বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির'সহ জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যুবা নেতৃবৃন্দ পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় "কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ ও সাম্প্রতিক শিল্প দুর্ঘটনা: যুব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের প্রস্তুতি ও করণীয়" শীর্ষক পাঠচক্র ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন কনফারেন্স হল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ ও সাম্প্রতিক শিল্প দুর্ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা, কোভিড-১৯ এবং কাজে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে আইএলও গাইডলাইন বিষয়ে আলোচনা এবং যুব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের প্রস্তুতি ও করণীয় বিষয়ে আলোচনার লক্ষ্যে এ পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়।

এফইএস এর আবাসিক প্রতিনিধি ফেলিক্স কোলভিটজ, বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন-বিএলফ এর সাধারণ সম্পাদক শাকিল আখতার চৌধুরী, বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমীন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির'সহ জাতীয় ফেডারেশন সমূহের যুব নেতৃবৃন্দ পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন।

বিল্‌স আয়োজিত জাতীয় সংলাপে বক্তারা

গৃহশ্রমিকদের শ্রম আইনে অন্তর্ভূক্ত করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এলাকা ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

গৃহশ্রমিকদের শ্রম আইনে অন্তর্ভূক্ত করে তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলাকা ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে বলে মত দিয়েছেন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। ৩১ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স সুনীতি প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত গৃহশ্রমিকের অধিকার, সুরক্ষা ও শোভন কাজ নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংলাপে বক্তারা এ আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য জেসমিন আরা বেগম বলেন, শ্রম আইন সংশোধন করে গৃহশ্রমিকদের আইনের আওতায় এনে তাদের কাজের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। তবে শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, আইনের সঠিক প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, গৃহশ্রমিক নির্যাতনের মামলায় সাক্ষীর অভাব ও বাদীপক্ষের আপোষের কারনে মামলাগুলোর সঠিক নিষ্পত্তি হয় না। এ জন্য তিনি জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে বলেন শুধুমাত্র গৃহশ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করলেই চলবে না নিয়োগকারীদের মনমানসিকতারও পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

সভায় বক্তারা বলেন, সঠিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমের ন্যায্য মজুরিতে দেশে কর্মসংস্থান হলে গৃহশ্রমিকদের বিদেশের মাটিতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হতে হবে না। তারা বলেন, জিডিপিতে গৃহশ্রমিকের অবদান নির্ণয় করতে হলে গৃহশ্রমিকদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। তার জন্য গৃহশ্রমিকদের সঠিক পরিসংখ্যানও প্রয়োজন। এছাড়াও তারা গৃহশ্রমিকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, তাদের সংগঠিত করা, ছুটি , বিশ্রাম, আট ঘন্টা কাজ, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

বিল্‌স চেয়ারম্যান মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ এর সভাপতিত্বে এবং গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী আবুল হোসাইন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিল্‌স মহাসচিব ও নির্বাহী পরিচালক নজরুল ইসলাম খান, বিল্‌স এর উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, বিল্‌স যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র পরিচালক (যুগ্মসচিব) জিনাত আরা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (রপ্তানীমূখী শিল্প অধিশাখা) মাহবুবা বিলকিস, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সামাজিক নিরাপত্তা) মুহাম্মদ শাখীর আহম্মদ চৌধুরী, শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক মো: বেল্লাল হোসাইন শেখ, সমাজসেবা অধিপ্তরের সমাজসেবা কর্মকতা কে এম শহীদুজ্জামান, ইনফরমাল সেক্টর-আইএসসি'র ভাইস চেয়ারম্যান মুনসুর হাসান খন্দকার, আইএলও ঢাকা অফিসের প্রোগ্রাম অফিসার শাহাবুদ্দিন খান, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ এর প্রকল্প সমন্বয়কারী গীতা রানী অধিকারী, বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন এবং উপপরিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ ইউসুফ আল মামুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সরকারি উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, গবেষক, বেসরকারি সংস্থা, গৃহশ্রমিক ইস্যুতে কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, গৃহশ্রমিক নেটওয়ার্ক নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

কোভিড-১৯ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এডভোকেসী পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় "কোভিড-১৯ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক : বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে এডভোকেসী পরিকল্পনা কর্মশালা ৩১ অক্টোবর ২০২১ হোটেল ভিস্তা বে, কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যমান শ্রম আইন, বিধি এবং নীতিমালায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বীকৃতি এবং সুরক্ষা'র গ্যাপ উপস্থাপন; উপস্থাপনার প্রেক্ষিতে শ্রম আইন, বিধি ও নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে এডভোকেসি কৌশল তৈরি'র লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কক্সবাজার জেলা শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মো: গিয়াস উদ্দিন এর সভাপতিত্বে 'কোভিড-১৯ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক: আইন ও বিধিমালায় স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি' বিষয়ক পেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির। আরো উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর আক্তার কামাল এবং মিজানুর রহমান মিজান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র এর সদস্য কল্লোল দে, জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ এর কক্সবাজার জেলা সভাপতি মো: আব্দুল জব্বার, এফইএস এর প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

এর আগে বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং ফ্রেডরিক-ইবার্ট-স্টিফটুং (এফইএস) এর সহযোগিতায় "কোভিড-১৯ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক : বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে" এডভোকেসী পরিকল্পনা কর্মশালা ২৫ অক্টোবর ২০২১ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যমান শ্রম আইন, বিধি এবং নীতিমালায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বীকৃতি এবং সুরক্ষা'র গ্যাপ উপস্থাপন; উপস্থাপনার প্রেক্ষিতে শ্রম আইন, বিধি ও নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে এডভোকেসি কৌশল তৈরি'র লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শ্রমিক লীগ চাঁদুপর জেলা'র সভাপতি মাহবুবুর রহমান এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় 'কোভিড-১৯ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক: আইন ও বিধিমালায় স্বীকৃতি ও সামাজিক সুরক্ষা পরিস্থিতি' বিষয়ক পেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বিল্‌স এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির। আরো উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি শাহ আলম মল্লিক, চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উপপরিচালক আব্দুর রাজ্জাক, এফইএস এর প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম সংবাদ:

জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে গোলটেবিল বৈঠক

বিল্‌স এর উদ্যোগে "জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্প শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং জীবনমান উন্নয়নে" গোলটেবিল বৈঠক ২৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর এশিয়ান এসআর হোটেলের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে এবং বিল্‌স এলআরএসসি পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান এ এম নাজিম উদ্দিন এর সঞ্চালনায় বৈঠকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিল্‌স যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান। বৈঠকে আরো বক্তব্য রাখেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপ সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প মালিক পক্ষের প্রতিনিধি বিএসবিআরএ'র সাবেক সহ সভাপতি এবং বর্তমান কমিটির সদস্য মাস্টার কাশেম, বিএসবিআ-রএ'র নির্বাহী সদস্য নাঈম শাহ ইমরান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ মহাপরিদর্শক আবদুল্লাহ সাকিব মুবাররত, চট্টগ্রাম শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সাব্বির ভুঁইয়া, আইএলও ঢাকা অফিসের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সাইদুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক নুরুল্লাহ বাহার, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শহিদুল্লাহ বাদল, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্পাদক পুলক রঞ্জন ধর, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জহির উদ্দিন মাহমুদ, বিল্‌স এর সম্পাদক ও জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্ত, জাহাজ-ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের কোষাধ্যক্ষ রিজওয়ানুর রহমান খান, বিলস্ কর্মকর্তা ফজলুল কবীর মিন্টু, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

সভায় বিএসবিআরএ প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, এনজিও, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষসমূহের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রামের জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডসমূহে বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশের গুণগত ও ইতিবাচক পরির্বতন, ইয়ার্ডসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর বাস্তবায়ন ও প্রচলিত শ্রম আইন কার্যকর করা সহ জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পকে একটি শ্রমিক-বান্ধব, শোভন, নিরাপদ ও টেকসই শিল্প হিসাবে গড়ে তোলা আজ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আইন-বিধি মেনে বর্জ্যমুক্ত জাহাজ আমদানী, জাহাজকে বিষাক্ত গ্যাস-কেমিকেল-ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত করা, মানবদেহ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-প্রতিবেশের জন্য নেতিবাচক ও ক্ষতিকর উপাদান ও জীবাণুসমূহ চিহ্নিতকরণ, পৃথকীকরণ ও অপসারণ, আধুনিক ও নিরাপত্তামুলক পদ্ধতিতে জাহাজ-কাটা, কর্মরত শ্রমিকেরা যাতে কোন প্রকার স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে না থাকে তা নিশ্চিত করা এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেন না হয় সেটি নিশ্চিতকরণে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

এসময় বক্তারা জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পের জন্য "বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮" এ জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পের জন্য প্রস্তাবিত বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি রাখা হয়নি বলেও অভিযোগ করেন। বক্তারা হংকং কনভেনশন ২০০৯ এর অনুসমর্থন ও সে অনুযায়ী এ শিল্প পরিচালনার উপর গুরুত্ব দেন।

সভায় মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, নিরাপদ ও টেকসই শিল্প গড়ার লক্ষে স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋন প্রদানের জন্য সরকারের নিকট দাবি জানান। তারা বলেন স্বল্পসুদে ঋন পেলে নিরাপদ ও টেকসই শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে নেয়া যাবে। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বিএসবিআরএ হাসপাতালে বার্ন ইউনিট যুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়।

সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে বিল্‌স এর মত বিনিময় সভা

বিল্‌স এর উদ্যোগে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এশিয়ান এসআর হোটেল, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।

জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্তের সভাপতিত্বে এবং বিল্‌স কর্মকর্তা ফজলুল কবির মিন্টুর সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক শিপন চৌধুরী, পরিদর্শক মাহমুদুল হাসান, শ্রম দপ্তরের সহকারী পরিচালক শফিকুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সহসভাপতি মু. শফর আলী, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এ এম নাজিম উদ্দিন, জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতা শফি বাঙ্গালী, ইপসা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী শাহীন, বিল্‌স এর সিনিয়র কর্মকর্তা পাহাড়ী ভট্টাচার্য, রিজওয়ানুর রহমান খান, পরিবেশবাদী সংগঠন বেলার কর্মকর্তা ফারমিন ইলাহী, টিইউসি নেতা ইফতেখার কামাল খান, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের মোঃ নূরুল আবসার, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আলী, বিএফটিইউসি নেতা কে এম শহিদুল্লাহ প্রমুখ।

সভায় শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয় পত্র প্রদান, সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করা,

রাত্রিকালীন এবং অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ না করানো, শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক ইয়ার্ডে দক্ষ সেফটি অফিসার নিয়োগ প্রদান, শ্রমিকদের মান সম্পন্ন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদ্যমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিমালা, চুক্তি, কনভেনশন ও গাইডলাইন মেনে বিষাক্ত বর্জ্যমুক্ত জাহাজ আমদানী নিশ্চিত করার পাশাপাশি আধুনিক ও নিরাপত্তামূলক পদ্ধতিতে জাহাজ-কাটা এবং কর্মরত শ্রমিকেরা যাতে কোন প্রকার স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে না থাকে তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

চট্টগ্রামে শ্রমিক সচেতনতামূলক ক্যাম্প

বিল্‌স এর উদ্যোগে করোনাকালে শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষা, শোভন এবং শ্রম আইন স্বীকৃত অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক সচেতনতামূলক ক্যাম্প ১১ অক্টোবর ২০২১ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, হালিশহর, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল নেতা মোঃ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স এলআরএ-সসি সেন্টার কোঅর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান এ এম নাজিম উদ্দিন। আরো বক্তব্য রাখেন নির্মাণ শ্রমিক নেতা মোঃ আলমগীর, মোঃ মহিউদ্দিন, মোঃ কামরুল ইসলাম এবং জসিমউদ্দিন রাশেদ, বিজেএসডি'র হাসিবুর রহমান বিপ্লব এবং ফিরোজ আলম, বিল্‌স সিনিয়র অফিসার পাহাড়ী ভট্টাচার্য, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন নির্মাণ শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তারা তাদের মৌলিক এবং শ্রম আইন স্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত। করোনাকালেও ও নির্মাণ শ্রমিকরা কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পান নি। শ্রমিকদের জীবন

জীবিকার সার্বিক উন্নতির জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

এর আগে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ একই ইস্যুতে চট্টগ্রামের বায়োজিদ থানার মোহাম্মদনগর এলকায় শ্রমিক সচেতনতা ক্যাম্প

অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শ্রমিক জোট চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মমিন এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বিল্‌স এলআরএসসি সেন্টার কোঅর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান এ এম নাজিম উদ্দিন, জাতীয় শ্রমিক জোটের শাহানা আক্তার, চম্পা আক্তার এবং হুমায়ুন কবির, বিল্‌স সিনিয়র অফিসার পাহাড়ী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এছাড়া ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ একই ইস্যুতে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানার কাঠঘর এলাকায় শ্রমিক সচেতনতামূলক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। বিএমএসএফ চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ নুরুল আবসার এর সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিল্‌স এলআরএসসি সেন্টার কোঅর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান এ এম নাজিম উদ্দিন, বিএমএসএফ এর নাজমা আক্তার, জুয়েল গাজী, মোঃ রুবেল এবং রুনা আক্তার, বিল্‌স সিনিয়র অফিসার পাহাড়ী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পকে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পকে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে বিল্‌স এবং জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের বিগত দিনের কার্যক্রমের পর্যালোচনা সভা ১২ অক্টোবর ২০২১ হোটেল রিজেন্ট পার্ক, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়।

জাহাজভাঙ্গা শিল্প সেক্টরে বিল্‌স-ডিটিডিএ'র উদ্যোগে বিগত দিনের কার্যক্রমের রিপোর্টিং এবং ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন এবং ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্তের সভাপতিত্বে এবং বিলস কর্মকর্তা ফজলুল কবির মিন্টু'র সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহিন চৌধুরী, ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক এ এম নাজিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি নাজিম উদ্দিন শ্যামল, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইপসার প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ আলী শাহিন, জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের কোষাধ্যক্ষ রিজওয়ানুর রহমান খান, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক নূরুল আবসার, বাংলাদেশ ফ্রী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কে এম শহিদুল্লাহ,

জাহাজভাঙ্গা শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ ইদ্রিছ এবং মানিক মন্ডল, বিল্‌স এর সিনিয়র কর্মকর্তা পাহাড়ি ভট্টাচার্য প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘ চার দশকের অধিক সময় ধরে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প সেক্টরের বাণিজ্যিক কার্যক্রম চললেও অত্যন্ত অনিরাপদ কর্ম পরিবেশে শ্রমিকেরা এখানে কাজ করে। নিরাপত্তাহীনতার কারনে প্রতি বছর এ সেক্টরে গড়ে ১৫ জনের বেশি শ্রমিক নিহত হয়। এসব ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক হলেও দায়ী ইয়ার্ড মালিকদের বিরুদ্ধে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে। নেতৃবৃন্দ বার বার শ্রমিক নিহত ও আহত হওয়ার জন্য দায়ী শিপ

ইয়ার্ড মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জোর দাবি জানান।

সভায় শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয় পত্র প্রদান, সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করা, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী রাত্রিকালীন কাজ বন্ধ রাখা এবং অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ না করানো, শ্রমিকের পেশাগত ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক ইয়ার্ডে দক্ষ সেফটি অফিসার নিয়োগ প্রদান, শ্রমিকদের মানসম্পন্ন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

নেটওয়ার্ক সংবাদ

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর এলাকা ভিত্তিক মানববন্ধন ও পদযাত্রা

গৃহশ্রমিকদের উপর সহিংসতা বন্ধে নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

গৃহশ্রমিকদের উপর সহিংসতা বন্ধ, আইনি সুরক্ষাসহ নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের সুচিকিৎসা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড সাতমসজিদ রোডে এলাকা ভিত্তিক মানববন্ধন ও পদযাত্রা থেকে এ দাবি জানানো হয়। গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে ও বিল্‌স/সুনীতি প্রকল্পের সহযোগিতায় এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের উপর নির্যাতন, হত্যা, ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো প্রভৃতি ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে। বিল্‌স এর সংবাদপত্র জরিপ অনুযায়ী ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত অন্ততঃ ২২ জন গৃহশ্রমিক হত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বক্তারা বলেন, দেশব্যাপী গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষায় প্রণীত 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫' বাস্তবায়ন না হওয়ায় দেশে একের পর এক গৃহশ্রমিকের মৃত্যু ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। তারা বলেন, বিচারহীনতার কারণে দোষীরা বার বার গৃহশ্রমিকদের উপর নির্যাতনের সাহস পায়। যদি এসব ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে সেই ভয়ে আর কেউ গৃহশ্রমিকদের নির্যাতনের সাহস দেখাবে না।

এসময় বক্তারা আইএলও কনভেনশন-১৮৯ অনুসমর্থন করাসহ সারাদেশে গৃহশ্রমিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫' বাস্তবায়ন, শ্রম আইনে গৃহশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা, গৃহশ্রমিকদের মামলায় সরকারিভাবে আইনি অভিবাসন নিশ্চিত করা, নির্যাতনে নিহত শ্রমিক পরিবার ও আহত শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান, আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ব্যয় নিয়োগকারী কর্তৃক বহন করা, নিহত শ্রমিক পরিবার ও আহত শ্রমিকদের স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি জানান।

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি মো: আব্দুল ওয়াহেদ, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক পূলক রঞ্জন ধর, জাতীয় শ্রমিক লীগের ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক সম্পাদক ফিরোজ হোসাইন, গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সদস্য সচিব ও বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, জাতীয় শ্রমিক লীগের নারী বিষয়ক সম্পাদক প্রমীলা পোদ্দার, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের আরিফা আক্তার প্রমুখ। এছাড়া বিল্‌স ও গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কভূক্ত মানবাধিকার সংগঠন, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পেশা পরিচিতি

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ও জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক

উন্নয়নশীল দেশগুলোর বদৌলতে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প পুরো বিশ্বে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মূলত যেসব পণ্যবাহী বা যাত্রীবাহী জাহাজের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, সেসব জাহাজের মালিকেরা ঐ জাহাজগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে তা বিক্রি করে। জাহাজভাঙ্গা শিল্প পুরাতন ও বাতিল, ডুবন্ত বা পরিত্যক্ত জাহাজ কারখানা বা কোনো সুবিধাজনক স্থানে কেটে ইস্পাত, তামার তৈরি ধাতব পদার্থ, ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি, সংযোজিত সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য পদার্থ আলাদা, সংরক্ষণ এবং বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার কাজকর্ম-সংক্রান্ত শিল্প। এটি একটি শ্রমমুখী শিল্প। সাধারণত একটি জাহাজের ৯৫ শতাংশই মাইল্ড স্টিল দিয়ে তৈরি হয়। ২ শতাংশ স্টেনলেস স্টিল এবং বাকি ৩ শতাংশ থাকে বিভিন্ন ধাতবের মিশ্রণ। প্রতি বছর প্রায় গড়ে ৬০০টি পুরানো জাহাজ দক্ষিণ এশিয়ার মত দেশগুলোতে কাটা হচ্ছে। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পকে কেন্দ্র করে এসব দেশের সমুদ্র সৈকতগুলোতে গড়ে উঠেছে বড় বড় রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রি। যেসব এলাকায় এ ধরনের ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে সেসব এলাকার অর্থনীতির মূল চাকা এই ইন্ডাস্ট্রিকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই শিল্প যেভাবে একদিকে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে অন্যদিকে সমগ্র বাস্তুসংস্থানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

বিশ্বের জাহাজভাঙ্গা শিল্প ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মত দরিদ্র, জনবহুল, জোয়ারভাটার বড় পার্থক্যসম্পন্ন সমুদ্র উপকূলীয় দেশেই গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ফৌজদার হাট থেকে কুমিরা পর্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা জাহাজভাঙ্গা শিল্পে প্রায় দুই লক্ষাধিক শ্রমিক জড়িত।

ইতিহাস:

প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই জলপথে তান্ডব চালানো

বিশাল সব অকেজো জাহাজ দিয়েই বিশ্বব্যাপী জাহাজ ভাঙা শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক রুপ পায়। যদিও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে তা শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ১৯৭০ এর দশকে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পরিবেশগত আন্দোলন এবং এই শিল্প সংশ্লিষ্ট শ্রমের খরচ অনেক বেড়ে যাবার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই শিল্প বিস্তার লাভ করে। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পায়িত দেশগুলো যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন এর মত দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে এই শিল্প উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে, যার প্রধান কারণ হচ্ছে অল্প পারিশ্রমিক, সস্তায় কাচাঁমালের যোগান ইত্যাদি। নব্বই দশকের পরে এই শিল্প দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোসহ দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীনসহ সমগ্র উন্নয়নশীলে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুলভ শ্রমিকের আশীর্বাদ হয়ে আসা এই শিল্প এই অঞ্চলে দ্রুত বিস্তার করে।

বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প:

১৯৬০ সালের ৩০ অক্টোবর উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালীতে প্রলয়ংকরী সাইক্লোনে প্রায় ১০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ওই সময় চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় আটকা পড়ে গ্রিক জাহাজ 'এমভি আলপাইন'। জাহাজটি নিয়ে সে সময় সংকট তৈরি হলে সেখানে দীর্ঘদিন জাহাজটি পড়ে থাকে। পরে চিটাগং স্টিল হাউজ সেই জাহাজটিকে কিনে নিজস্ব উদ্যোগে এবং স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ভেঙে এর যন্ত্রপাতি ও ধাতব অংশ বাজারে বিক্রি করে। এ অঞ্চলের জাহাজ ভাঙার কার্যক্রম শুরু মূলত তখন থেকেই। তবে বাণিজ্যিকভাবে জাহাজ ভাঙার কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা পায় আরো পরে। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জাহাজ 'আল আব্বাস' ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এ জাহাজ বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে কিনে নেয় কর্ণফুলী মেটাল ওয়ার্কস। এ জাহাজ ঘিরেই ফৌজদারহাট এলাকার বিস্তৃত জায়গাজুড়ে জাহাজ ভাঙা শিল্পের

শুরু হয়। মূলত স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে কর্ণফুলী মেটাল ওয়ার্কস নিয়মিত দেশী-বিদেশী জাহাজ ভাঙার কাজ বাণিজ্যিকভাবে শুরু করে।

আশির দশকজুড়ে ধীরগতিতে এগোনোর পর জাহাজ ভাঙা শিল্পে বিনিয়োগের জোয়ার আসতে শুরু করে মূলত নব্বইয়ের দশকে। জাহাজ প্রতি একটি নির্দিষ্ট মূলধন ব্যয় করে দিগুণ-তিন গুণ লাভের হাতছানি দেখে চট্টগ্রাম ও ঢাকাকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা ঝুঁকতে শুরু করেন এ ব্যবসার দিকে। সেই সঙ্গে দেশে ইস্পাতের চাহিদা পূরণে কাঁচামাল জোগানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উৎস হয়ে ওঠে এ জাহাজ ভাঙা শিল্প।

বাংলাদেশের এই জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পটি প্রায় ৪২.২ শতাংশ সমুদ্রগামী জাহাজ ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রিসাইক্লিং মার্কেটের একটা বড় অংশই দখল করে নিয়েছে, যেখানে ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক বাজারের ২৫.৬ শতাংশ ভারত, ২১.৫ শতাংশ পাকিস্তান, টার্কিরা ২.৩ শতাংশ আর চীনারা ভাঙ্গে ২ শতাংশ জাহাজ।

যেসব কারণে বাংলাদেশে এ শিল্পে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে তা হলো: ক. এ শিল্প বিকাশের জন্য চট্টগ্রামের (ফৌজদারহাট থেকে কুমিরা পর্যন্ত) এ অঞ্চলটি প্রাকৃতিকভাবে বেশ অনুকূল। এখানে রয়েছে তুলনামূলকভাবে কম গভীর ও দীর্ঘ ঢালু সমুদ্র উপকূল, সঙ্গে জোয়ারভাটার বিশাল (১০-১৫ ফুট) পার্থক্যের কারণে সেখানে খুব সহজেই পরিত্যক্ত জাহাজকে নোঙর করে আটকানো যায়; খ. স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক প্রাপ্তি; গ. স্থানীয় স্টিল কারখানা, জাহাজ নির্মাণশিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে সংগৃহীত স্টিলপ্লেট, লোহা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা; এবং ঘ. এ শিল্প এলাকাটির সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল এবং সংগৃহীত সামগ্রী স্বল্পসময়ে ও কম খরচে পরিবহণ সম্ভব।

কর্মসংস্থান:

জাহাজের আকার এবং মানের উপর ভিত্তি করে একটি জাহাজ ভাঙ্গার জন্য প্রায় ৩০০-৫০০ শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। এর পাশাপাশি অনেক কর্মী নিযুক্ত থাকে, যারা জাহাজের আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো পুনর্ব্যবহার এর উপযোগী করে তোলে। চট্টগ্রামের উত্তর উপকূল ধরে প্রায় ১২০টি জাহাজ ভাঙ্গার কারখানা রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এই সংখ্যা বেড়েই চলছে। ফলে তৈরি হয়েছে প্রচুর কর্মসংস্থান। ৫০ হাজারের বেশি মানুষ সরাসরি এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এ শিল্পের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত প্রায় ১০ লাখ মানুষ।

মজুরি:

জাহাজ ভাঙা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আগে ছিল চার হাজার ৬২৫ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৬ হাজার টাকা। চারটি গ্রেডের মধ্যে সর্বশেষ গ্রেডের (অদক্ষ বা চতুর্থ গ্রেড) শ্রমিকদের মূল মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে আট হাজার টাকা। মূল মজুরির ৫০ শতাংশ হিসেবে শ্রমিকরা বাড়ি ভাড়া ভাতা পাবেন চার হাজার টাকা। দুই হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ও এক হাজার ৫০০ টাকা যাতায়াত ভাতাসহ একজন শ্রমিকের মোট মাসিক মজুরি ১৬ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। দৈনিক হিসেবে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৬১৫ টাকা।

জাহাজ ভাঙ্গার পদ্ধতি:

জাহাজ ভাঙ্গার পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের। উন্নত দেশগুলো জাহাজ ভাঙ্গার পদ্ধতিতে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছে। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো এখনও পুরানো পদ্ধতিতে এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে এসব দেশগুলোতে নিয়মিত বিরতিতে দূর্ঘটনা ঘটছে এবং প্রাণহানি ঘটছে। জাহাজ শিল্পের সাথে সংযুক্ত মেরিন ইনসাইট নামের একটি সংগঠন এর মতে বর্তমান বিশ্বে জাহাজ ভাঙ্গার ১০টি প্রথা চালু রয়েছে। এই ১০টি পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে যে পদ্ধতি জনপ্রিয় সেটি হচ্ছে সমুদ্র সৈকতে জাহাজকে টেনে এনে সেখানে ভাঙ্গা। এটাকে বিচিং পদ্ধতি বলে। অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতিটিকে আয়ত্ত করার প্রধান কারণে হচ্ছে স্বল্প খরচ এবং অধিক লোকবলের সরবরাহের নিশ্চিয়তা। যদিও এই পদ্ধতির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙা শিল্পে বিচিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ

পদ্ধতিতে ব্যয়বহুল ও ভারি অবকাঠামোর প্রয়োজন হয় না। বিচিং পদ্ধতিতে জোয়ারের সর্বোচ্চ উচ্চতা ব্যবহার করে জাহাজকে তার নিজস্ব শক্তিতে কর্দমাক্ত সমুদ্র তীরে টেনে তোলা হয়। তারপর ভাটার সময় শ্রমিকের সাহায্যে জাহাজটিকে কেটে ফেলা হয়। কাটা অংশগুলো শক্তিশালী উইন্স এবং শ্রমশক্তি দিয়ে শুকনা জায়গায় নিয়ে আসা হয়। গ্যাস কাটিং এর সাহায্যে জাহাজকে সাধারণত কাটা হয়। সাধারণত কাটার সময় ন্যূনতম সাবধানতা, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে অনেক সময় বিস্ফোরণ, মারাত্মক জখম, স্থায়ী বিকলাঙ্গ এমন কি মৃত্যুর মত দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

কর্ম পরিবেশঃ

জাহাজ ভাঙ্গার সময় জাহাজে বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ থাকতে পারে যা মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। জাহাজ ভাঙা শিল্পে সাধারণত এজবেসটস, পিসিবি, বিলজ ও ব্যালাস্ট জাতীয় পানি, তৈল ও জ্বালানির অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি জাতীয় বর্জ্য থাকতে পারে। মেটাল কাটিং-এর সময় বিষাক্ত ধোঁয়া বাতাস দূষণ করতে পারে। অনেক সময় তেল ও সলাজ এর উপস্থিতির কারণে জাহাজ কাটার

সময় আগুন ধরে যেতে পারে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ অথবা পরিবেশ সম্মতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে স্ক্র্যাপ মেটাল ও অন্যান্য বর্জ্য মাটি ও পানিকে দূষণ করতে পারে। জাহাজের ভিতরে ও বাইরে যেসব রং ব্যবহার করা হয় সেগুলোতেও বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত পদার্থ যেমন পিসিবি, ভারি ধাতু এবং কীটনাশক জাতীয় পদার্থ থাকে। ফলে রং সরানোর সময় উদ্বায়ী ও বিষাক্ত পদার্থ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। জাহাজ ভাঙার সময় গ্রাইন্ডিং, হেমারিং, মেটাল কাটিংসহ অন্য কার্যক্রমে উৎপন্ন অতিরিক্ত শব্দ শ্রবণ শক্তিজনিত ব্যাঘাত, উদ্বিগ্নতা, হৃদরোগসহ ঘুমের ব্যাঘাতজনিত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলাদেশে অনেক জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে শ্রমিকরা দুর্ঘটনারোধী উপকরণ ব্যবহার করে না। এমন কি যেখানে অক্সিজেনের স্বল্পতাজনিত কারণে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে, সেখানেও সঠিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে না। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শ্রমিকরা তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত নয় কিংবা এ সমস্ত ঝুঁকি কিভাবে কমানো যায় সেগুলো সম্পর্কে তাদের কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। সঠিকভাকে সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে মাটি এমন কি ভুগর্ভস্ত পানির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী দূষণ হতে পারে। বেশিরভাগ ইয়ার্ডের নিজস্ব কোন বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো সুবিধাও নাই। সেখানে শ্রমিকেরা প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য ও জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। এমনকি শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষামূলক সরাঞ্জামাদী (PPE) সরবরাহ করা হয়না। ফলে মৃত্যু ঝুঁকি নিয়েই শ্রমিকেরা বছরের পর বছর কাজ করে চলেছে। এছাড়া জাহাজে থাকা ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান এসবেস্টস পরিবেষ্টিত পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় বিধায় তাদের ফুসফুসের নানাবিধ জটিল রোগসহ ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

অর্থনীতিতে অবদানঃ

জাহাজভাঙ্গা শিল্প দেশের লোহার মূল চাহিদা পূরণ করে। নির্মাণশিল্পসহ অর্থনৈতিকভাবে এ শিল্পের অবদান অনেক। দশ লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। জাহাজ নির্মাণ, বাড়ি নির্মাণ, রি-রোলিং কারখানা, স্টিল ও রডের কারখানার মূল কাঁচামাল জাহাজভাঙ্গার কাঁচামাল থেকে সংগৃহীত হয়। স্থানীয় রড ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ৬০ শতাংশের বেশি যোগান দেয়া হয় এই শিল্প থেকে। ফলে এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে অনেক বড় বড় স্টিল ও রিরোলিং মিল। এছাড়াও ভাঙ্গার জন্য আনা জাহাজগুলোতে অনেক পুরাতন ভাল ও উন্নত মানের আসবাবপত্রসহ বহু মূল্যবান গৃহস্থালি সামগ্রী পাওয়া যায়। ঐ সকল পুরাতন আসবাবপত্রসহ গৃহস্থালি সামগ্রী বিক্রীর জন্য এখানে অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ষাটের দশকে শুরু হওয়া বাংলাদেশের এই শিল্প কেবল স্থানীয়ভাবে নয় বরং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ শিপ ব্রেকারস অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএসবিআরএ) এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৫ সালে ২২১টি, ২০১৬ সালে ২৫০টি, ২০১৭ সালে ২১৪টি, ২০১৮ সালে ১৯৬টি এবং ২০১৯ সালে

২৩৬টি জাহাজ পুনর্ব্যবহারের জন্য ভাঙ্গা হয়।

বৈশ্বিক অর্থনীতিতেও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। বিশ্ববাজারে বর্তমানে ৪০ হাজার কোটি ডলারের বাজার উন্মুক্ত রয়েছে। এই বাজার ধরতে উন্নয়নশীল দেশগুলো এই শিল্পের দিকে মনোযোগী হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ভারতের এক কোম্পানী অ্যালাং ১৯৮২ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মোট ৩৮০০টি মেয়াদ উত্তীর্ণ জাহাজ ভাঙ্গে যা গড়ে প্রায় ১৮১ টি। কিন্তু আশ্চার্যজনক ভাবে ঐ একই কোম্পানী ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ২৫০ টি জাহাজ ভাঙ্গে। এই ছোট একটি সমীক্ষা থেকে বুঝা যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে এই শিল্পের প্রভাব কতটুকু। এর মধ্যে থেকে কিছু পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য রপ্তানি করা হয় এবং বাকিগুলো বিক্রি করা হয় স্থানীয় বাজারে, যেগুলো পুনরায় ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশের জাহাজগুলোতে। ব্যবহারযোগ্য জাহাজের এই অংশগুলোর স্থানীয় অর্থনীতিতে রয়েছে বিপুল চাহিদা।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা:

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এই শিল্পকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য মালিক, শ্রমিক ও সামজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থাগুলোকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার দিকে কতৃপক্ষকে নজর দিতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতে হবে জাহাজের পরিবেশ নিরাপদ কিনা।

শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রতি সংখ্যায়ই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি। এ সংখ্যায় নবম অধ্যায়ের কর্মঘন্টা ও ছুটি সংক্রান্ত ধারামূহ তুলে ধরা হলো: (গত সংখ্যার পর)

১০৮। অধিকাল কর্মের জন্য অতিরিক্ত ভাতা।- (১) যে ক্ষেত্রে কোন শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে কোন দিন বা সপ্তাহে এই আইনের অধীন নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ করেন, যে ক্ষেত্রে তিনি অধিকাল কাজের জন্য তাহার মূল মজুরী ও মহার্ঘভাতা এবং এড-হক বা অন্তবর্তী মজুরী, যদি থাকে, এর সাধারণ হারের দ্বিগুন হারে ভাতা পাইবেন।

(২) ঠিকা-হার (পিস রেট) ভিত্তিতে মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকগণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবেনা। *(২০১৮ সালের সংশোধনী দ্বারা প্রতিস্থাপিত)*

(৩) এই ধারার বিধান পালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রক্ষনীয় রেজিষ্টার বিধিদ্বারা নির্ধারন করিতে পারিবে। *(সংশ্লিষ্ট বিধি-১০২, ফরম-৩৪)*

১০৯। মহিলা শ্রমিকের জন্য সীমিত কর্মঘন্টা।- কোন মহিলা শ্রমিককে তাহার বিনা অনুমতিতে কোন প্রতিষ্ঠানে রাত দশ ঘটিকা হইতে ভোর ছয় ঘটিকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন কাজ করিতে দেওয়া হইবে না। *(সংশ্লিষ্ট বিধি-১০৩, ফরম-৩৫, ৩৫(ক), ৩৬)*

১১০। দ্বৈত চাকুরীর উপর বাধা।- মহা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের বিনা অনুমতিতে এবং তৎকর্তৃক আরোপিত শর্ত ব্যতীত, কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে একই দিনে একাধিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে দেওয়া হইবে না। (সংশ্লিষ্ট বিধি-১০৪)

১১১। প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের কাজের সময়ের নোটিশ এবং উহার প্রস্তুতি।- (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে উহাতে কর্মরত প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকগণ কোন্ কোন্ সময় কাজ করিবেন ইহা পরিস্কারভাবে লিখিয়া একটি নোটিশ ধারা ৩৩৭ এর বিধান অনুযায়ী প্রদর্শিত হইবে এবং প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধভাবে রক্ষিত হইবে।

(২) উক্ত নোটিশে প্রদর্শিত সময় এই ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বেই স্থির করিতে হইবে এবং উহা এমন হইবে যেন উক্ত সময়ে কর্মরত শ্রমিকগণকে ধারা ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩ এবং ১০৫ এর বিধানের খেলাপ করিয়া কাজ না করানো হয়।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে একই সময় সমূহ কাজ করিতে হয় সে ক্ষেত্রে মালিক উক্ত সময় সমূহ সাধারণভাবে স্থির করিবেন।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে একই সময় সমূহে কাজ করিতে হয় না সে ক্ষেত্রে মালিক উক্তরূপ শ্রমিকগণকে তাহাদের কাজের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন দলে ভাগ করিবেন, এবং প্রত্যেক দলের শ্রমিক সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(৫) যে দলকে কোন পালা পদ্ধতিতে কাজ করিতে হয় না, সে দলকে কোন্ সময় কাজ করিতে হইবে, তাহা মালিক নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(৬) যে ক্ষেত্রে কোন দলকে পালা পদ্ধতিতে কাজ করিতে হয়, এবং রিলে গুলি অনির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমিক পালা পরিবর্তনের অধীনে নয় সে ক্ষেত্রে উক্তরূপ প্রত্যেক দলের রিলেকে কোন্ সময় কাজ করিতে হইবে তাহা মালিক নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(৭) যে ক্ষেত্রে কোন দলকে পালা পদ্ধতিতে কাজ করিতে হয়, এবং রিলে গুলি পূর্ব নির্দিষ্ট পর্যায় ক্রমিক পালা পরিবর্তনের অধীন সে ক্ষেত্রে মালিক পালার একটি স্কীম প্রণয়ন করিবেন যেখানে কোন্ দলের রিলেকে কোন্ দিনের কোন্ সময়ে কাজ করিতে হইবে- তাহা জানা যাইবে।

(৮) এই ধারার অধীন কাজের সময় সম্পর্কিত কোন নোটিশের দুইটি কপি কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু হইবার পূর্বে অনুমোদনের জন্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৯) উক্ত নোটিশের একটি কপি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক, উহা প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে, কোন সংশোধন প্রয়োজন হইলে উহা নির্দেশ করিয়া মালিকের নিকট ফেরত পাঠাইবেন, এবং মালিক উক্তরূপ সংশোধন, যদি থাকে, অবিলম্বে কার্যকর করিবেন, এবং প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডে উক্তরূপ অনুমোদন সংরক্ষণ করিবেন।

(১০) কোন প্রতিষ্ঠানের কাজের পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তনের প্রস্তাবে যদি নোটিশের পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে তাহা হইলে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের পূর্বে উহার দুইটি কপি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত উক্তরূপ কোন পরিবর্তন কার্যকর করা যাইবে না।

(১১) কোন প্রতিষ্ঠানে কোন দিনের কাজের নির্ধারিত সময়ের আধা ঘন্টা পরে যদি কোন শ্রমিক কাজে হাজির হন তাহা হইলে মালিক উক্ত শ্রমিককে উক্ত দিনের কাজে নিয়োগ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(সংশ্লিষ্ট বিধি- ১০৫, ফরম- ৩৭, ৩৭(ক), ৩৭(খ))

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
বাড়ি # ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১১৬৫৫৩ ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল: bils@citech.net
www.bilsbd.org